"হে আল্লাহ! হে হেদায়াতের আলোর উৎস! তোমার
অপার অনুগ্রহে এ উম্মতের চোখ খুলে দাও।
উদ্ঘাটিত এ তত্ত্বের দিকে হে সত্যান্বেষী! এক নজর তাকাও
যাতে অলীক ধ্যান-ধারণা ও সন্দেহ সংশয় থেকে মুক্তি পাও।"
-প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)

রাযে হাকীকত

[প্রকৃত তত্ত্ব উদ্ঘাটন]

পুস্তকটিতে হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবনের সঠিক ঘটনাবলী
এবং ঘোষণাকৃত মুবাহালা সম্পর্কে কিছু হিতোপদেশ ও
এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে।

হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)
আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা

বঙ্গানুবাদ : মাওলানা আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

পুস্তকের নাম	*ঃ*	*রাযে হাকীকত*
লেখকের নাম	*ঃ*	*হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ* *মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)*
অনুবাদক	*ঃ*	*মাওলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্ বাংলাদেশ*
প্রথম সংস্করণ (উর্দু)	*ঃ*	*৩০ নভেম্বর ১৮৯৮*
প্রথম সংস্করণ (বাংলা)	*ঃ*	*সেপ্টেম্বর ২০০২ (বাংলাদেশ)*
বর্তমান সংস্করণ	*ঃ*	*ডিসেম্বর, ২০১৯ (ভারত)*
সংখ্যা	*ঃ*	*৫০০*
প্রকাশক	*ঃ*	*নাজারত নশর ও এশায়াত* *সদর আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়া, কাদিয়ান, গুরুদাসপুর, পাঞ্জাব*
মুদ্রণে	*ঃ*	*ফজল-এ-ওমর প্রিন্টিং প্রেস, কাদিয়ান, গুরুদাসপুর, পাঞ্জাব*

Raaz-e-Haqiqat

By

Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani[as]

The Promised Messiah & Mahdi

Translated By	:	Maulana Ahmad Sadeq Mehmood
First Edition (urdu)	:	30 November 1898
First Edition (Bengali)	:	September 2002 (Bangladesh)
Present Edition	:	December 2019 (India)
Copies	:	500
Published by	:	Nazarat Nashr-o-Ishaat Sadr Anjuman Ahmadiyya, Qadian, Gurdaspur, Punjab-143516
Printed at	:	Fazle Umar Printing Press, Qadian, Gurdaspur, Punjab-143516

ٹائیٹل بار اول

اے خدا اے چشمۂ نور ھدیٰ
از کرم ہا چشم این اُمت کشا
یک نظر کن سوئے این راز نہان
تا رہی اے طالب از وہم گمان

الحمد للہ والمنہ

کہ یہ رسالہ جس کا نام ہے

راز حقیقت

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح اور سچے سوانح ظاہر کرتا ہے اور ہمارے مباہلہ کے متعلق
کئی نصیحتیں کر کے اصل غرض مباہلہ بتلاتا ہے

اور بمقام قادیان مطبع ضیاء الاسلام میں باہتمام حکیم فضل الدین صاحب
بھیروی مالک مطبع چھپا ہے اور بتاریخ
۳۰ نومبر ۱۸۹۸ء
شایع ہوا

প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

প্রকাশকের কথা

'রাযে হাকীকত' শিরোনামে পুস্তকটি সৈয়্যদনা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী আলায়হেস্ সালাম ৩০শে নভেম্বর, ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে উর্দূ ভাষায় প্রণয়ন করেন। পুস্তকটির বঙ্গানুবাদ করেছেন মাওলানা আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্ বাংলাদেশ। যা সর্বপ্রথম ২০০২ সালে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়।

পুস্তকটি নতুন আঙ্গিকে কম্পোজিং করেছেন মোকাররমা বুশরা হামিদ সাহেবা এবং আরবী সহ সম্পূর্ণ সেটিং এর দায়িত্ব পালন করেছেন মোকাররম কাজী আয়াজ মহম্মদ সাহেব, মোয়াল্লিম সিলসিলা। পুস্তকটি পর্যবেক্ষণ ও

প্রয়োজনীয় সংশোধন করেছেন মোকাররম জাহিরুল হাসান সাহেব ইনচার্জ বাংলা ডেস্ক কাদিয়ান, মোকাররম আবুতাহের মণ্ডল সাহেব সদর রিভিউ কমিটি বাংলা এবং মোকাররম শেখ মহম্মদ আলী সাহেব সদর এশায়া'ত কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ।

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) এর অনুমোদনে প্রথমবার পুস্তকটির বাংলা সংস্করণ কাদিয়ান থেকে প্রকাশ হচ্ছে।

পুস্তিকাটি প্রকাশে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে আল্লাহ্তা'লা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন এবং ইহার মুদ্রণ সর্বদিক থেকে কল্যাণময় করুন। আমীন ॥

হাফিয মখদুম শরীফ

ডিসেম্বর, ২০১৯, কাদিয়ান

নাযির নশর ও এশায়া'ত কাদিয়ান

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

ভূমিকা

'রাযে হাকীকত' পুস্তকটি প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্দী হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ (আ.) ৩০শে নভেম্বর, ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে উর্দূ ভাষায় প্রণয়ন করেন। এতে তিনি পবিত্র কুরআন ও হাদীস এবং ঐতিহাসিক দলিল-প্রমাণ ও তত্ত্ব-তথ্যের মাধ্যমে হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবনের প্রকৃত ঘটনাবলী তুলে ধরে প্রমাণ করেন যে, হযরত ঈসা (আ.) ক্রুশ-বিদ্ধ হয়ে নিহত হন নি, বরং ক্রুশ থেকে উদ্ধার পেয়ে সুস্থাবস্থায় ফিলিস্তিন থেকে হিজরত করেন এবং বিভিন্ন দেশ সফর ক রে ভারতবর্ষে আসেন। অবশেষে তিনি কাশ্মীরে ১২০ (একশ' বিশ) বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন ও শ্রীনগরের খান ইয়ার মহল্লায় সমাহিত হন। সেখানে তার ঐতিহাসিক সমাধি রয়েছে। এ পুস্তকে সে সমাধির নকশাসহ বিশদ তত্ত্ব-তথ্যাদি সম্বলিত তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে যা হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন ধ্যান-ধারণাগুলোকে সমূলে উৎপাটন করে।

এছাড়া, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যে মুবাহালা ঘোষণা করেছিলেন এ পুস্তকটিতে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য তুলে ধরে তার জামাতকে কিছু জরুরী উপদেশ দান করেন। আর সেই সাথে মৌলবী মুহাম্মদ হুসেন বাটালবী ও তার সাথীদের কিছু আপত্তির উত্তর অত্যন্ত যুক্তি-যুক্ত ও জোরালোভাবে প্রদান করেন।

আল্লাহ্ তাআলার ফযলে এখন এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। উর্দূ ভাষায় প্রণীত ***'রাযে হাকীকত'*** পুস্তকটির বঙ্গানুবাদ করেছেন মাওলানা আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্ এবং দেখে দিয়েছেন মাওলানা সালেহ্ আহ্মদ সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্। প্রুফ রিডিংয়ে যথারীতি জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান সাহেব সাহায্য করেন। আল্লাহ্ তাআলা এ পুস্তকটির প্রকাশনায় সংশ্লিষ্ট সকলকে পুরস্কৃত করুন।

অবশেষে বিনীত দোয়া, আল্লাহ্ তাআলা যেন পুস্তকটি বাংলা ভাষাভাষী পাঠকবৃন্দের জন্য হেদায়াত ও ঈমান বৃদ্ধির কারণ করেন। আমীন ॥

ওয়াসসালাম।

খাকসার

মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর
আহ্মদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

২৩ সেপ্টেম্বর , ২০০২ খ্রীষ্টাব্দ

بسم الله الرحمن الرحيم

نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِیْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ

[যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে ও যারা সৎ কর্মপরায়ণ
নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের সাথে আছেন (অনুবাদক)।]

"مبادا دل آں فرو مایہ شاد
کہ از بہر دنیا دہد دیں بباد"

আমি আমার জামাতের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করছি তারা যেন 'ইশাআতুস সুন্নাহ' পত্রিকার প্রকাশক শেখ মুহাম্মদ হুসেন বাটালবী ও তার দুই সহকারীর সম্পর্কে মুবাহালাস্বরূপ ২১শে নভেম্বর ১৮৯৮ইং তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির ফলাফলের জন্য অপেক্ষমান থাকেন যার মেয়াদকাল ১৫ই জানুয়ারি, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হবে।

এ প্রসঙ্গে আমি আমার জামাতকে উপদেশস্বরূপ কিছু কথা বলছিঃ তারা যেন দৃঢ়ভাবে তাক্বওয়া (আল্লাহর প্রতি ভয় ভক্তি ভালবাসা)-এর পথে প্রতিষ্ঠিত থেকে কটু কথার উত্তরে কটু কথা না বলেন ও গালির উত্তরে গালি না দেন। তারা অনেক হাসি বিদ্রূপের কথা শুনতে পাবেন যেমন শুনছেন, কিন্তু তাদের নীরব থাকা, তাক্বওয়া ও সৎকর্মপরায়ণতার সাথে খোদা তাআলার মীমাংসার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা উচিত। যদি খোদা তাআলার দৃষ্টিতে সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য হতে চান তাহলে সত্যপরায়ণতা, তাক্বওয়া ও ধৈর্যশীলতাকে যেন হাত ছাড়া হতে না দেন। এখন মকদ্দমার নথি-পত্র সেই আদালতের সামনে রয়েছে যা কারও পক্ষ সমর্থন করে না, আর ঔদ্ধত্যের আচার-আচরণও পছন্দ করে না। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ আদালত কক্ষের বাইরে থাকে যদিও তার পাপের জন্যও শাস্তি রয়েছে, কিন্তু সে ব্যক্তির অপরাধের শাস্তি অনেক কঠোর, যে আদালতের সামনে দাঁড়িয়ে ঔদ্ধত্য দেখিয়ে অপরাধ করে। সেজন্য আমি তোমাদেরকে বলি, খোদা তাআলার আদালতের অবমাননাকে ভয় কর। নম্রতা, বিনয়, ধৈর্য ও

একটি ঘোষণা : *ডিসেম্বর মাসে ছুটির দিনগুলিতে (সালানা) জলসা অনুষ্ঠিত হতো, কিন্তু এবার এ মাসে আমি নিজে ও আমার স্ত্রী এবং অধিকাংশ নারী ও পুরুষকর্মী মৌসুমী রোগ ব্যধিতে অসুস্থ বিধায় মেহমানদের সেবা-যত্ন ও আপ্যায়নে বিঘ্ন ঘটবে। আরও কিছু কারণ রয়েছে যা লিখলে কলেবর বৃদ্ধির কারণ হবে। সেজন্য ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, এবার জলসা হবে না। আমাদের সকল ভ্রাতা এ সম্বন্ধে অবহিত থাকুন। ওয়াস্ সালাম, ঘোষণাকারী -**মির্যা গোলাম আহ্মদ***

তাক্বওয়া অবলম্বন কর, এবং খোদা তাআলার কাছে চাও তিনি যেন তোমাদের ও তোমাদের জাতির মাঝে ফয়সালা করে দেন।

তোমাদের পক্ষে শেখ মুহাম্মদ হুসেন ও তার সঙ্গীদের সাথে কখনও সাক্ষাৎ না করাই উত্তম। কেননা প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ ঝগড়া বিবাদ ঘটার কারণ হয়ে যায়। আরও উত্তম হবে যদি তোমরা এ সময়টিতে কোন তর্ক বিতর্কও না কর। কেননা তর্ক-বিতর্কে কথা-বার্তায় তীব্রতা ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অবশ্যই তোমাদের জন্য সৎকর্মশীলতা, সত্যবাদিতা ও খোদা ভীরুতায় এগিয়ে যাওয়া আবশ্যক। কেননা যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে, খোদা তাদেরকে বিনষ্ট হতে দেন না। দেখ, হযরত মূসা নবী (আ.), যিনি তাঁর যুগে সবচেয়ে বেশি সহনশীল ও তাক্বওয়াপরায়ণ ছিলেন তিনি তাকওয়ার কল্যাণে ফেরাউনের ওপরে কিরূপ বিজয়ী হয়েছিলেন! ফেরাউন তাঁকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল, কিন্তু মূসা (আ.)-এর চোখের সামনে খোদা তাআলা ফেরাউনকে তার সমস্ত বাহিনীসহ ধ্বংস করলেন। তারপর হযরত ঈসা (আ.)-এর সময়ে দুর্ভাগা ইহুদীরা তাঁকে ধ্বংস করতে চাইল শুধু তাই নয়, বরং তাঁর পবিত্র আত্মার উপর লা'নতের কলঙ্ক লেপন করতে চাইল। কেননা তাওরাতে লেখা ছিল, যে ব্যক্তি কাষ্ঠে অর্থাৎ ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মারা যায় সে লা'নতী (অভিশপ্ত) হয় অর্থাৎ তার আত্মা কলুষিত, অপবিত্র; সে খোদার নৈকট্য হতে দূরে এবং ঐশী দোরগোড়া হ'তে বিতাড়িত ও শয়তান সদৃশ। আর এজন্যই 'লায়ীন' (অভিশপ্ত) শয়তানের নাম। সুতরাং হযরত ঈসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে ঐ অযোগ্য জাতি এমন এক জঘন্য পরিকল্পনার কথা চিন্তা করলো, যা বাস্তবায়নের দ্বারা তারা যেন সাব্যস্ত করতে পারে যে, তিনি পবিত্রাত্মা, খোদার প্রিয় ও সত্য নবী ছিলেন না। কেননা তিনি নাঊযুবিল্লাহ্ অভিশপ্ত অর্থাৎ তাঁর আত্মা কিনা অপবিত্র, বরং লা'নত শব্দের দ্বারা যা বুঝায়, সে অনুযায়ী তিনি মনে প্রাণে খোদার প্রতি অসন্তুষ্ট এবং খোদা তার প্রতি অসন্তুষ্ট। কিন্তু ক্বাদের (সর্বশক্তিমান) ও 'ক্বাইউম' (সংরক্ষণকারী) খোদা অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ইহুদীদেরকে ঐ ইচ্ছা পূরণে বিফল মনোরথ করেন এবং তাঁর নবীকে (আ.) ক্রুশীয় মৃত্যু থেকে রক্ষা করেন। বরং তাঁকে একশ' বিশ বছর* পর্যন্ত

টীকা : *সহী হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, হযরত ঈসা (আ.) একশ' বিশ বছর আয়ু লাভ করেছিলেন। কিন্তু ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের সর্বসম্মত মতে ক্রুশের ঘটনা যখন ঘটে, তখন হযরত ঈসা (আ.)-এর বয়স ছিল মাত্র তেত্রিশ (৩৩) বছর। এ দলিল-প্রমাণ থেকে সুস্পষ্ট জানা যায় যে, হযরত ঈসা (আ.) ক্রুশ থেকে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে উদ্ধার পাওয়ার পর অবশিষ্ট জীবন ভ্রমণ ও পর্যটনে অতিবাহিত করেছিলেন। সহী হাদীসাবলীতে এ প্রমাণও রয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.) ছিলেন 'সাইয়াহ' অর্থাৎ ভ্রমণ ও পর্যটনকারী নবী। অতএব যদি তিনি ক্রুশীয় ঘটনায় সশরীরে আকাশে চলে গিয়ে থাকেন তাহলে ভ্রমণ (সিয়াহাত)*

জীবিত রেখে সকল শত্রু ইহুদীকে তাঁর জীবদ্দশায়ই ধ্বংস করেন। তবে অতীতে এমন কোনও দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী নবী হন নি যিনি জাতির নির্যাতনের কারণে হিজরত করেন নি, খোদা তাআলার চিরন্তন এ সুন্নত (রীতি) অনুযায়ী হযরত ঈসাও (আ.) তিন বছরব্যাপী তবলীগের পর ক্রুশীয় ফেতনা (পরীক্ষা) থেকে রক্ষা পাওয়ার পরে পরে ভারতবর্ষের দিকে হিজরত করেন এবং বেবিলন বিপর্যয়ের সময়ে ভারতবর্ষ, কাশ্মীর ও তিব্বতে বিতাড়িত হয়ে আসা ইহুদীদের অন্যান্য গোত্রগুলোকে খোদা তাআলার বার্তা পৌঁছে দিয়ে অবশেষে ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরে ইন্তেকাল করেন ও শ্রীনগরের খানিয়ার মহল্লায় সম্মানে সমাহিত হন। তাঁর মাযার অত্যন্ত প্রসিদ্ধ (এক তীর্থস্থান)। يُزَارُ وَيُتَبَرَّكُ بِهٖ মানুষ তা যিয়ারত করে

*কোন সময়ে করলেন? অথচ আভিধানিকগণও 'মসীহ্' শব্দের একটি তাৎপর্য এটাই বর্ণনা করেন যে, এ শব্দের উৎপত্তি হচ্ছে 'মাসাহ্' (ধাতু) থেকে এবং 'মাসাহ' সিয়াহত (ভ্রমণ বা পর্যটন)-কে বলা হয়। তাছাড়া এ ধর্মবিশ্বাস সম্পূর্ণ অহেতুক বলে প্রতীয়মান হয় যে, খোদা ইহুদীদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য হযরত ঈসাকে (আ.) দ্বিতীয় আসমানে পৌঁছে দিয়েছিলেন। কেননা খোদার এ কাজের দ্বারা ইহুদীদেরকে আদৌ দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। ইহুদীরা তো তাঁকে আকাশে উঠে যেতেও দেখেনি এবং আজ পর্যন্ত তাঁকে নামতেও দেখে নি। অতএব তারা এ অর্থহীন, আজগুবী ও প্রমাণবিহীন কেচ্ছাকে কি করে মানতে পারে? তাছাড়া এ-ও লক্ষণীয় বিষয় যে, খোদা তাআলা তাঁর মহিমান্বিত রসূল হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে ইহুদীদের চেয়েও বেশি দুঃসাহসী, যোদ্ধা ও বিদ্বেষী কুরায়শদের আক্রমণ থেকে কেবল গুহার আশ্রয়ে রক্ষা করলেন যা মক্কা থেকে তিন মাইলের বেশি দূরে ছিল না। অতএব খোদা তাআলা কি নাউযুবিল্লাহ্ কাপুরুষ, যিনি ইহুদীদের পক্ষ থেকে এতই ভয় পেয়েছিলেন যে, তাঁর মন থেকে ইহুদীদের হস্তক্ষেপের খটকা ঈসা (আ.)-কে দ্বিতীয় আকাশে পৌঁছে দেওয়া ছাড়া দূর হতে পারতো না? বরং এটা সম্পূর্ণ মনগড়া কাহিনী, যা কুরআন করীমের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী এবং অত্যন্ত জোরালো দলীল-প্রমাণের দ্বারা মিথ্যা সাব্যস্ত। আমি বর্ণনা করে এসেছি, ক্রুশীয় ঘটনার প্রকৃত স্বরূপ সনাক্ত করার জন্য [ঈসা (আ.)-এর ক্ষত নিরাময়ে ব্যবহৃত] **'মরহমে ঈসা'** নামের মলমটি এক সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভের উপায় এবং সত্যকে জানা ও চেনার একটি উচ্চ পর্যায়ের সনদ ও দলিল বটে। এ বিষয়ে আমি এজন্য পুরোপুরি ওয়াকেবহাল যে, আমার পিতা মরহুম মির্যা গোলাম মুর্তযা, যিনি এ জেলার একজন সম্ভ্রান্ত সম্মানিত রইস (প্রধান) ছিলেন, তিনি এমন একজন উচ্চস্তরের অভিজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন, যিনি তাঁর জীবনের প্রায় ষাট বছর এ অভিজ্ঞতায় অতিবাহিত করেছিলেন ও যথাসম্ভব উপায়ে চিকিৎসাশাস্ত্রের দুর্লভ গ্রন্থাদির এক বড় ভান্ডার সংগ্রহ করেছিলেন। আমি নিজে চিকিৎসা শাস্ত্রের বই-পুস্তক পড়েছি এবং সর্বদা ঐ গ্রন্থগুলোতে মনোনিবেশ করি। সেজন্যও আমি আমার ব্যক্তিগত অধ্যয়ন ও জ্ঞান থেকে বর্ণনা করছি যে, এক হাজারেরও বেশি এরূপ গ্রন্থ রয়েছে যেগুলোতে উক্ত 'মরহমে ঈসা' অর্থাৎ ঈসার মলমের উল্লেখ রয়েছে। এগুলোতে এ-ও লেখা আছে যে, এ মলমটি হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্য বানানো হয়েছিল। এ গ্রন্থগুলোর কোন কোনটি ইহুদীদের রচিত, কোন কোনটি খ্রীষ্টানদের এবং কোন কোনটি মাজুসী (পার্সি)-দের রচিত গ্রন্থ। অতএব এটা এমন এক জ্ঞানমূলক গবেষণালব্ধ প্রমাণ যাতে নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ঈসা (আ.) ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে নিহত হওয়া থেকে রেহাই পেয়েছিলেন। যদি ইঞ্জিল রচয়িতারা এর বরখেলাপ লিখে থাকে তাহলে তাদের সাক্ষ্য বিন্দু মাত্র আস্থাযোগ্য নয়। কেননা*

এবং তা থেকে বরকত লাভ করে থাকে।

অনুরূপ, খোদা তাআলা আমাদের প্রভু ও অভিভাবক নবীয়ে আখেরিজ্জামান মুহাম্মদ (স.)-কে যিনি 'সৈয়্যদুল মুত্তাকীন' (মুত্তাকীদের সর্দার) ছিলেন, অসংখ্য ধরনের সাহায্য সমর্থনের মাধ্যমে বিজয়ী করেন। যদিও প্রথম দিকে হযরত মূসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)-এর ন্যায় হিজরতের কষ্ট তাঁর ভাগ্যেও জোটে। কিন্তু সে হিজরতেই ঐশী সাহায্য ও বিজয়ের মৌলিক উপাদানসমূহ নিহিত ছিল। অতএব হে বন্ধুগণ! নিশ্চিত জেনে নিন, মুত্তাকীকে কখনও ধ্বংস করা হয় না। যখন দু'টি দল পরস্পর শত্রুতা করে ও বিবাদকে চরম সীমায় পৌঁছে দেয় তখন যে দলটি আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তাক্বওয়াপরায়ণ (আল্লাহ্-ভীরু) ও সংযমশীল হয়ে থাকে তাদের জন্য আসমান থেকে সাহায্য অবতীর্ণ হয়। আর এরূপে আসমানী সিদ্ধান্তের দ্বারা ধর্মীয় বিবাদের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। দেখ, আমাদের প্রভু ও অভিভাবক আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কিরূপ দুর্বল অবস্থায় মক্কায় আবির্ভূত হয়েছিলেন, আর আবু জাহল ইত্যাদি কাফেরদের

প্রথমত: ওরা ক্রুশের ঘটনার সময় উপস্থিত ছিল না, ওরা নিজেদের প্রভু ঈসার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা অবলম্বন করে সকলেই পালিয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয়ত: ইঞ্জিলগুলোতে প্রচুর স্ববিরোধ রয়েছে। এমন কি, বার্ণবাসের ইঞ্জিলে হযরত ঈসা (আ.)-এর ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মারা যাওয়াকে অস্বীকার করা হয়েছে। তৃতীয়ত: বড়ই বিশ্বাসযোগ্য বলে বিবেচিত এ ইঞ্জিলগুলোতেও লেখা আছে যে, হযরত ঈসা (আ.) ক্রুশের ঘটনার পর তাঁর হাওয়ারীদের (অর্থাৎ শিষ্যদের) সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর ক্ষতগুলো তাদেরকে দেখান। অতএব এ বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তখন তাঁর দেহে বিদ্যমান ক্ষতের জন্য মলম প্রস্তুত করার প্রয়োজন ছিল। কাজেই নিশ্চিত বুঝা যায় এ উপলক্ষেই সে মলম তৈরী করা হয়েছিল। ইঞ্জিলগুলো থেকে এ-ও প্রমাণিত যে, ঈসা (আ.) চল্লিশ দিন ঐ এলাকার আশে-পাশে গোপনে অবস্থান করেন। তারপর মলম ব্যবহারে যখন সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন তখন তিনি সফর অবলম্বন করেন।

*আফসোস, রাওয়ালপিন্ডির জনৈক ডাক্তার সাহেব এক বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন। তাতে তিনি 'ঈসার মলম' সংক্রান্ত ব্যবস্থা-পত্রটি যে বিভিন্ন জাতির গ্রন্থাদিতে বিদ্যমান তা অস্বীকার করেন। কিন্তু মনে হয়, হযরত ঈসা (আ.) ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে যে মারা যান নি, বরং ক্ষতবিক্ষত জীবিতাবস্থায় ক্রুশ থেকে রেহাই পান- এ ঘটনাটি শুনে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ওঠেন ও মনে করেন, তাতে প্রায়শ্চিত্তবাদের সকল পরিকল্পনা বাতিল হয়ে পড়ে। কিন্তু যে সকল গ্রন্থে **'মরহমে ঈসা'** এর ব্যবস্থা-পত্রটি মজুদ রয়েছে সেগুলোর অস্তিত্ব সম্বন্ধে অস্বীকার করাটা বাস্তবিকই লজ্জাজনক। যদি তিনি সত্যান্বেষী হয়ে থাকেন তাহলে আমার নিকট এসে যেন ঐ গ্রন্থগুলো দেখে যান। বস্তুত: উক্ত **'ঈসার মলম'** সংক্রান্ত জ্ঞানগত সাক্ষ্যটি যে ঐ সব (ভ্রান্ত) ধর্ম-বিশ্বাসকে রদ করে-ও-এতে প্রায়শ্চিত্তবাদ ও ত্রিত্ববাদ ইত্যাদির সমস্ত ইমারত নিমিষে ভেঙ্গে পড়ে, খ্রীষ্টানদের জন্য কেবল এ বিপদই নয় বরং ইদানিং উল্লেখিত প্রমাণের সমর্থনে আরো প্রমাণাদিও বেরিয়ে এসেছে। কেননা অনুসন্ধানে প্রমাণিত যে, হযরত মসীহ্ (ঈসা আ.) ক্রুশীয় বিপর্যয় থেকে পরিত্রাণ পেয়ে সুনিশ্চিত ভারতবর্ষের দিকে সফর করেন এবং নেপাল হয়ে অবশেষে তিব্বতে পৌঁছেন, তারপর কাশ্মীরে কিছু কাল অবস্থান করেন এবং*

কতো প্রতিপত্তি ছিল! লক্ষ লক্ষ মানুষ আঁ হযরত (স.)-এর প্রাণের শত্রু হয়ে গিয়েছিল। তারপর তা কী ছিল যা পরিণামে আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে সফলতা ও বিজয় এনে দিয়েছিল? নিশ্চিত জেনো, তা ঐ সত্যপরায়ণতা, নিষ্ঠা, হৃদয়ের পবিত্রতা ও সততাই ছিল। অতএব হে ভ্রাতাগণ! দৃঢ়পদক্ষেপে এগিয়ে চল এবং এ পথে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাবে প্রবেশ করো। অতঃপর অচিরে দেখবে, খোদা তাআলা তোমাদের সাহায্য করবেন। সেই খোদা যিনি দৃষ্টির অন্তরালে গোপন রয়েছেন কিন্তু সব কিছুর চেয়ে অধিক উজ্জ্বল ও প্রকাশমান, যার জালাল ও প্রতাপকে ফেরেশতারাও ভয় করে। তিনি ধৃষ্টতা ও চালাকীকে পছন্দ করেন না। যারা তাঁকে ভয় করে তাদের প্রতি তিনি দয়া করেন। অতএব তাঁকে ভয় কর ও প্রত্যেক কথা বুঝে সুঝে বল। তোমরা হচ্ছ তারই জামাত,

---

বেবিলন বিপর্যয়ের সময় যে সকল বনী ইস্রাঈলী গোত্র বিতাড়িত হয়ে কাশ্মীরে বসবাসরত ছিল তাদেরকে হেদায়াত দান করেন, অবশেষে একশ' বিশ বছর বয়সে শ্রীনগরে ইন্তেকাল করেন ও খান ইয়ার মহল্লায় সমাহিত হন। ভুল জনশ্রুতিতে তিনি ইয়োয আসফ নবী নামে প্রসিদ্ধি পেয়ে যান। এ ঘটনার সমর্থন সে ইঞ্জিলও করে যা সম্প্রতি তিব্বত থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। এ ইঞ্জিলটি অনেক চেষ্টায় লন্ডনে পাওয়া গিয়েছে। আমাদের আন্তরিক নিষ্ঠাবান ব্যবসায়ী বন্ধু শায়খ রহমতুল্লাহ্ সাহেব প্রায় তিন মাস যাবৎ লন্ডনে অবস্থান করে এ ইঞ্জিলটি তালাশ (অনুসন্ধান) করতে থাকেন, অবশেষে পেয়ে যান। এ ইঞ্জিল বৌদ্ধ ধর্মের প্রাচীন গ্রন্থাবলীর একটা অংশ বিশেষ। বৌদ্ধধর্মের পুস্তকাবলী থেকে এ সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, হযরত ঈসা (আ.) ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং কিছুকাল ঐ জাতিদেরকে হিতোপদেশ দিতে থাকেন। বৌদ্ধধর্মের পুস্তকাদিতে যে তাঁর এসব দেশে আসার কথা লিপিবদ্ধ করা হয় তার সে কারণ নয় যা লাবনে বর্ণনা করেন অর্থাৎ তিনি*

**** পাদটিকা :** এক অজ্ঞ মুসলমান তার মন থেকে বানিয়ে বলেছে যে, হয়তো **'ইয়োয আসফ'** দ্বারা সেই আসফের স্ত্রীকে বুঝায় যিনি সোলায়মান (আ.)-এর মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু এ মুর্খ লোকটার এদিকে খেয়াল যায় নি যে, আসফের স্ত্রী নবী ছিল না এবং তাকে 'শাহজাদা' বলা যায় না। সে এ-ও চিন্তা করে নি যে, এ দুটোই পুংলিঙ্গ বাচক শব্দ। স্ত্রীলিঙ্গের জন্য যদি তার এ গুণগুলো থাকেও তবু তাকে 'নাবিইয়া ও শাহ্জাদী' বলা হবে, নবী ও শাহ্জাদাহ্ বলা হবে না। এ সোজা সরল লোকটা এ-ও খেয়াল করে নি যে, উনিশ শ' বছরের সময়কাল হযরত ঈসা (আ.)-এর যুগের সাথে মিল খায়। সোলায়মান (আ.) তো তাঁথেকে কয়েক শ' বছর পূর্বে ছিলেন। তাছাড়া, শ্রীনগরে যাঁর কবর রয়েছে সেই নবীকে কেউ কেউ ইয়োয আসফ নামে ডাকে কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বলে, এটা হযরত ঈসা (আ.)-এর কবর। আমাদের একনিষ্ঠ ভ্রাতা কাশ্মীর নিবাসী মৌলবী আব্দুল্লাহ্ সাহেব যখন শ্রীনগরে এ মাযার সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে শুরু করলেন তখন কিছু লোক ইয়োয আসফের নাম শুনে বললেন, 'আমাদের মধ্যে এ কবর ঈসা সাহেবের কবর বলে খ্যাত'। সুতরাং অনেক লোক এ সাক্ষ্যই দিলেন, যারা এখনও শ্রীনগরে জীবিত রয়েছেন। যার সন্দেহ থাকে সে নিজে কাশ্মীরে গিয়ে কয়েক লক্ষ মানুষের নিকট জিজ্ঞেস করে জেনে নিক। এখন, এরপর অস্বীকার নির্লজ্জতা বৈ কিছু নয়। -গ্রন্থকার*

যাদেরকে তিনি পুণ্যের দৃষ্টান্ত দেখাবার জন্য বেছে নিয়েছেন। অতএব যে ব্যক্তি পাপ পরিত্যাগ করে না এবং তার জিহ্বাকে সে মিথ্যা থেকে এবং তার অন্তরকে নাপাক খেয়াল ও অপবিত্র চিন্তা থেকে রক্ষা করে না তাকে এ জামাত থেকে কেটে দেয়া হবে। হে খোদার বান্দাগণ! নিজেদের হৃদয়কে নির্মল কর ও অন্তরকে ধুয়ে ফেল। তোমরা কপটতা ও দ্বৈততা (দু'মুখী স্বভাব)- এর দ্বারা সবাইকে রাজী করতে পার কিন্তু এ স্বভাবের দ্বারা তোমরা খোদার ক্রোধকে উত্তেজিত করবে। নিজেদের প্রাণের প্রতি দয়া কর ও নিজেদের বংশধরকে ধ্বংস হওয়া থেকে বাঁচাও। তোমাদের অন্তরে যদি আল্লাহ্‌র চেয়ে অন্য কেউ অধিক প্রিয় ও

*নাকি গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা থেকে উপকৃত হয়ে তা গ্রহণ করেছিলেন। ওই রূপ বলা এক দুষ্টামি। বরং প্রকৃত সত্য হলো, খোদা তাআলা যখন হযরত ঈসাকে (আ.) ক্রুশের দুর্ঘটনার অনিষ্ঠ থেকে রক্ষা করলেন তখন ঐ ঘটনার পর সে দেশে থাকা আর সমীচীন মনে করলেন না এবং যেভাবে কুরায়েশদের যুলুম-অত্যাচারের সময়ে অর্থাৎ যখন তারা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে হত্যা করতে চেয়েছিল তখন আঁ হযরত (স.) তাঁর মাতৃভূমি থেকে হিজরত করেছিলেন, সেভাবেই হযরত ঈসা (আ.) ইহুদীদের চরম যুলুমের সময়ে অর্থাৎ যখন তারা তাঁকে হত্যা করতে চায় তখন তিনি হিজরত করেন। আর যেহেতু কিছু সংখ্যক ইহুদী গোত্র (বেবিলন সম্রাট) নবুখদনিৎসরের আক্রমণের ঘটনায় বিক্ষিপ্ত হয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং কাশ্মীর, তিব্বত ও চীনের দিকে হিজরত করে চলে এসেছিল, তাই হযরত ঈসা (আ.) এ দেশগুলোর দিকেই হিজরত করে যাওয়াকে সমীচীন মনে করেন। ইতিহাস থেকে এ বিষয়েরও সন্ধান পাওয়া যায় যে, এ সব দেশে কিছু সংখ্যক ইহুদী তাদের আদি রীতি ও পুরান স্বভাব অনুযায়ী বৌদ্ধধর্মেও দীক্ষা নিয়েছিল। সুতরাং সম্প্রতি যে সিভিল এন্ড মিলিটারী গ্যাজেট পত্রিকায় ২৩ নভেম্বর ১৮৯৮ তারিখে একটি প্রবন্ধ ছেপেছে তাতে একজন ইংরেজ গবেষক এ বিষয়টি স্বীকারও করেছেন এবং একথা মেনে নিয়েছেন যে, ইহুদীদের কোন কোন গোত্র এ দেশে (অর্থাৎ ভারতবর্ষে) ও পার্শ্ববর্তী দেশে স্থায়ী নিবাস গ্রহণ করেছিল। তিনি সিভিল এন্ড মিলিটারী গ্যাজেটের একই সংখ্যায় আরও লিখেছেন: 'প্রকৃতপক্ষে আফগানরাও বনী ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত।' মোট কথা, যখন কিছু সংখ্যক বনীইস্রাঈল (ইহুদী) বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়ে গিয়েছিল, তখন হযরত ঈসা (আ.)-এর পক্ষে এদেশে এসে বৌদ্ধধর্মের খন্ডনের দিকে মনোযোগী হওয়া ও এ ধর্মের গুরুদের সাথে সাক্ষাৎ করা আবশ্যকীয় ছিল। সুতরাং তা-ই ঘটেছিল। সেজন্যই বৌদ্ধধর্মের বই-পুস্তকে হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবনের ঘটনাবলী লেখা হয়েছে। প্রতীয়মান হয় যে, ঐ সময়ে এদেশে বৌদ্ধধর্মের অনেক প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল এবং বৈদিক ধর্ম নিষ্প্রাণ হয়ে পড়েছিল। বস্তুত বৌদ্ধধর্ম বেদকে অস্বীকার করতো। **

মোট কথা, এ যাবতীয় বিষয়কে একত্রিত করলে নিশ্চিতভাবে এ সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় যে, অবশ্য অবশ্যই হযরত ঈসা (আ.) এদেশে এসেছিলেন। একথা সুনিশ্চিত ও পাকাপোক্ত যে, বৌদ্ধধর্মের পুস্তকাদিতে এদেশে তাঁর আসার উল্লেখ রয়েছে। আর কাশ্মীরে হযরত ঈসা (আ.)-এর মাযার যে প্রায় ১৯০০ বছর ধরে মজুদ আছে বলে বর্ণনা করা হয় তা উল্লেখিত বিষয়ের স্বপক্ষে অতি উঁচু স্তরের প্রমাণ বটে। যথাসম্ভব এ মাযারের সঙ্গে

***পাদটীকা:** বৌদ্ধধর্মের কোন কোন বই পুস্তকে ভারতবর্ষে ও তিব্বতে হযরত ঈসা (আ.)- এর আগমনের উল্লেখ ও আলোচনা রয়েছে; কেবল তাই নয় বরং বিশ্বস্ত সূত্রে ও প্রামাণ্য উপায়ে জানতে পেরেছি যে, কাশ্মীরের পান্ডুলিপিগুলোতেও তার উল্লেখ ও আলোচনা রয়েছে।*

সম্মানের পাত্র হয়ে থাকে তা হলে কখনও সম্ভব নয় যে, তিনি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। যদি খোদাকে দুনিয়াতে দেখতে চাও তাহলে তাঁর পথে উৎসর্গীত হয়ে যাও, তাঁর জন্য আত্মবিলীন হও, সর্বতোভাবে তাঁরই হয়ে যাও। কেরামত কী এবং অলৌকিক ঘটনাবলী কখন ঘটে? নিশ্চিত জানবে ও স্মরণ রাখবে, হৃদয়ের পরিবর্তন আকাশের পরিবর্তনকে (অর্থাৎ ঐশী সাহায্য) চায়। যে আগুন (মনস্তাপ) নিষ্ঠার সাথে প্রজ্বলিত হয় তা ঊর্ধ্ব লোকে নিদর্শন রূপে প্রকাশিত হয়। সকল মু'মিন যদিও সাধারণভাবে প্রত্যেক বিষয়ে অংশীদার রয়েছে, এমন কি প্রত্যেকে তুচ্ছ ধরনের সাধারণ স্বপ্নও দেখে থাকে এবং কারও প্রতি ইলহামও হয়। কিন্তু সেই কেরামত যাতে খোদার প্রতাপ ও জ্যোতি: বিদ্যমান থাকে এবং যা খোদাকে দেখিয়ে দেয়, তা খোদা তাআলার এক বিশেষ সাহায্যে হয়ে থাকে যা ঐ বান্দাদের সম্মান বৃদ্ধির জন্য প্রকাশ করা হয় যারা এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র দরবারে আত্মোৎসর্গের মর্যাদা রাখেন। যখন দুনিয়াতে তাঁদের অপমান ও অবমাননা করা হয়, তাঁদেরকে খারাপ বলা হয়- চরম মিথ্যাবাদী, কৃত্রিম ওহী ইলহাম রচনাকারী ও মিথ্যাদাবীদার, পাপাচারী, অভিশপ্ত, দাজ্জাল, ঠগ ও প্রতারক বলে তাঁদেরকে অভিহিত করা হয় এবং তাঁদেরকে ধ্বংস করে দেওয়ার চেষ্টা

কিছু সংখ্যক ফলকলিপিও থাকবে, যা আপাততঃ গোপন রয়েছে। এ যাবতীয় বিষয়ের অধিকতর অনুসন্ধানের জন্য আমাদের জামাত থেকে একটি গবেষণাকারী দল প্রস্তুত হচ্ছে যাদের প্রধান নিযুক্ত হয়েছেন আমাদের প্রিয়ভ্রাতা মৌলবী হেকীম হাজী হারামায়ন নূরুদ্দীন সল্লামাহু রব্বুহু। এ দলটি উক্ত বিষয়ে খোঁজ খবর ও অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করবেন। এই কর্মতৎপর নিষ্ঠাবানদের কাজ হবে, পালি ভাষার পুস্তকাবলীও দেখা। কেননা এ-ও জানা গেছে যে, হযরত মসীহ্ (আ.) ঐ অঞ্চলেও তাঁর 'হারানো মেষগুলোর' খোঁজে এসেছিলেন। কিন্তু অবশ্যই কাশ্মীরে যাওয়া, তারপর তিব্বতে গিয়ে বৌদ্ধধর্মের পুস্তকাবলী থেকে এ যাবতীয় বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করা এ প্রতিনিধিদলটির অভীষ্ট লক্ষ্য ও কতর্ব্য হবে। লাহোর নিবাসী ব্যবসায়ী আমার প্রিয়ভ্রাতা শেখ রহমাতুল্লাহ্ সাহেব এ সকল ব্যয় নির্বাহের ভার নিজ কাঁধে গ্রহণ করে নিয়েছেন। কিন্তু যদি এই সফর পরিকল্পনা অনুযায়ী বেনারস, নেপাল, মাদ্রাজ, সওয়াত, কাশ্মীর ও তিব্বত ইত্যাদি এলাকা পর্যন্ত করা হয়, অর্থাৎ যেখানে যেখানে হযরত মসীহ্ (আ.)-এর বসবাস সম্পর্কে সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, তাহলে নিঃসন্দেহে এটা এক বড় ধরনের ব্যয় সাপেক্ষ কাজ হবে। আশা করা যায়, যে করেই হোক আল্লাহ্ তাআলা একে সুসম্পন্ন করবেন। প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষ বুঝতে পারেন, এ হচ্ছে এমন এক প্রমাণ যদ্বারা খ্রীষ্টান ধর্মের পাতানো জাল এক নিমিষেই ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পড়ে এবং উনিশ শ' বছরের পরিকল্পনা সহসা নস্যাৎ হয়ে যায়। ভারতবর্ষের কাশ্মীর ইত্যাদি জায়গায় হযরত মসীহ্ (আ.)-এর আগমন যে একটি বাস্তব ঘটনা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত ও নিশ্চিত হওয়া গেছে। এ সম্পর্কে এরূপ অকাট্য ও জোরালো প্রমাণাদি পাওয়া গিয়েছে যে, এখন তা কোনও বিরুদ্ধবাদীর পরিকল্পনার জোরে গোপন থাকতে পারবে না। প্রতীয়মান হয় যে, এসব অহেতুক ও ভ্রান্ত ধর্মবিশ্বাসের এ যুগ পর্যন্তই আয়ু ছিল। আমাদের প্রভু ও নেতা হযরত খাতামুল আম্বিয়া সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যে বলে গিয়েছেন, আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ক্রুশ ভঙ্গ

করা হয় তখন তাঁরা এক পর্যায় পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ ও আত্মসংবরণ করেন। অতঃপর খোদা তাআলার আত্মাভিমান যখন তাদের সমর্থনে কোনো নিদর্শন দেখাতে চায়,তখন সহসা তাদের হৃদয় ব্যথিত ও ক্ষতবিক্ষত হয়–তখন তাঁরা খোদা তাআলার দোরগোড়ায় সকরুণ আকুতি-মিনতির সাথে ঝুঁকে যান। তাঁদের বেদনাভরা দোয়া আসমানে ভীষণ এক আর্তনাদ সৃষ্টি করে। আর যেভাবে তীব্র গরমের পর আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ দেখা দেয়, তারপর তা একত্র হয়ে স্তরে স্তরে জমাট এক মেঘপুঞ্জে পরিণত হয় ও সহসা বর্ষিত হতে শুরু করে। তেমনিভাবে নিষ্ঠাবানদের যথাসময়ের বেদনা-ভরা আকুতি-মিনতি মেঘপুঞ্জ হয়ে উত্থিত হয়। আর পরিশেষে এক নিদর্শনের আকারে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়। মোট কথা, যখন কোন সত্যপরায়ণ নিষ্ঠাবান ওলী-আল্লাহ্‌র ওপর কোন যুলুম অত্যাচার চরম সীমায় পৌঁছে যায় তখন বুঝা উচিত এখন কোন নিদর্শন প্রকাশিত হবে।

هر بلا کیں قوم را حق دادہ است زیر آں گنج کرم بنہادہ است

'হর বালা কিঁ কওম রা হক্ দাদাহ্ আস্‌ত/যেরে আঁ গঞ্জে করম বানেহাদাহ্ আস্‌ত। আফসোসের সাথে আমাকে এখানে একথা লিখতে হচ্ছে যে, আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা অন্যায়-অবিচার, মিথ্যা ও বক্রতার আশ্রয় নিতে বিরত হয় না। তারা খোদা তাআলার কথাকে বড়ই দুঃসাহসী হয়ে মিথ্যা আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করে ও মহা প্রতাপশালী খোদার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা ঘোষণা করে। আমি আশা করেছিলাম যে, শেখ মুহাম্মদ হুসেন বাটালভী, মুহাম্মদ বখ্‌শ জা'ফর জাটলি ও আবুল হাসান তিব্বতিকে উদ্দেশ্য করে ২১ নভেম্বর, ১৮৯৮ইং তারিখে

*করবে ও স্বর্গীয় অস্ত্রের সাহায্যে দাজ্জালকে বধ করবে- এ হাদীসের অর্থ এখন স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এই মসীহ মাওউদের সময়ে জমিন ও আসমানের খোদা নিজ পক্ষ থেকে বহু এরূপ বিষয় ও উপকরণের উদ্ভব ঘটাবেন যদ্বারা ত্রিত্ববাদ ও প্রায়শ্চিত্তবাদের ক্রুশীয় আকীদা-বিশ্বাস আপনা-আপনি উধাও হয়ে যাবে। মসীহ্‌র আকাশ থেকে নাযেল (অবতীর্ণ) হওয়াও এ অর্থেই ছিল যে, তখন আসমানের খোদার ইচ্ছায় ক্রুশভঙ্গের জন্য জাজ্জ্বল্যমান সাক্ষ্য-প্রমাণ সৃষ্টি হয়ে যাবে। সুতরাং তদ্রূপই ঘটেছে। এটা কে জানতো যে, ঈসা (আ.) এর জন্য ব্যবহৃত মলম সংক্রান্ত বিবরণ যা (ইউনানী) চিকিৎসা শাস্ত্রের গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ রয়েছেতা বেরিয়ে আসবে? আর এটা কে-ই বা জানতো যে, বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন পুস্তকাদি থেকে এ প্রমাণ বেরিয়ে আসবে যে, হযরত ঈসা (আ.) সিরিয়া-ফেলেস্তিনের ইহুদীদের প্রতি নিরাশ হয়ে ভারতবর্ষ, কাশ্মীর ও তিব্বতের দিকে গিয়েছিলেন? * একথাও কে-বা জানতো যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর কাশ্মীরে কবর রয়েছে? মানুষের কি*

**** পাদটীকা :** সাম্প্রতিককালে মুসলমানদের প্রণীত প্রাচীন গ্রন্থাদিও হস্তগত হয়েছে যেগুলোতে স্পষ্ট এ বর্ণনা মজুদ রয়েছে যে, ইয়োয আসফ একজন নবী ছিলেন যিনি অন্য কোনো দেশ থেকে এসেছিলেন এবং কাশ্মীরে ইন্তেকাল করেন। আর এ-ও বর্ণনা করা হয় যে, এ নবী আমাদের নবী করীম (সা.)-এর ছয় শ' বছর পূর্বে গত হয়েছেন।*

যে বিজ্ঞপ্তিটি লেখা হয়েছিল তার পরে এ লোকগুলো নীরবতা অবলম্বন করবে, কেননা বিজ্ঞপ্তিতে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছিল যে, ১৫ জানুয়ারি ১৯০০ইং পর্যন্ত এ বিষয়ের নিষ্পত্তির জন্য মেয়াদ নির্দিষ্ট হয়ে গেছে, যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হবে তাকে আল্লাহ্ তাআলা লাঞ্ছিত করবেন। বস্তুত এটা সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীকে নির্ধারণের সুস্পষ্ট মানদণ্ড স্বরূপ ছিল যা খোদা তাআলা তাঁর ইলহামের মাধ্যমে কায়েম করেছেন। এ লোকদের উচিত ছিল উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবার পর চুপ থাকতো এবং ১৫ জানুয়ারি, ১৯০০ তারিখ পর্যন্ত খোদা তাআলার সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করতো। কিন্তু আফসোস, তারা তা করেনি। বরং উল্লেখিত জাটলি ৩০ নভেম্বর, ১৮৯৮ তারিখে প্রকাশিত তার বিজ্ঞাপনকে আবারও ঐ সব নোংরামিতে ভরে দিয়েছে যা তার নিত্যকার রীতি এবং তাতে সে আদ্যোপান্ত

সাধ্য ছিল যে, এ যাবতীয় বিষয় নিজ ক্ষমতার জোরে সৃষ্টি করে দিতে পারতো? এখন এ সকল ঘটনা এমনভাবে খ্রীষ্টধর্মকে মিটিয়ে দেয় যেভাবে দিনের উদয় হলে রাত মিটে যায়। এ ঘটনা সপ্রমাণ হওয়ার দরুন খ্রীষ্টধর্মকে সে আঘাত লাগে যা ঐ ছাদে লাগতে পারে যার সমস্ত ভার একটি কড়ি-কাঠের ওপর ছিল, তারপর কড়ি-কাঠ ভেঙ্গে যাওয়ায় ছাদ ধ্বসে পড়লো। অনুরূপ, এ ঘটনার প্রমাণ হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে খ্রীষ্টধর্মের অবসান অবধারিত। খোদা যা চান, করেন। এ সকল কুদরতের দ্বারাই তাঁকে জানা ও চেনা যায়। দেখ, এ আয়াতের কত উত্তম অর্থ সাব্যস্ত হয়: ***ওয়ামা কাতালুহু ওয়া মা সালাবুহু ওয়ালা কিন সুব্বেহালাহুম*** وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ *(সুরা নিসা: ১৫৮) অর্থাৎ মসীহ্কে হত্যা করা বা ক্রুশে দিয়ে মেরে ফেলা সবই মিথ্যা। প্রকৃত ব্যাপারটি হচ্ছে, এ লোকদের ধোঁকা লেগেছে, মসীহ্ খোদা তাআলার ওয়াদা অনুযায়ী ক্রুশ থেকে রক্ষা পেয়ে বেরিয়ে যান। ইঞ্জিলে যদি গভীরভাবে লক্ষ্য করা হয় তাহলে ইঞ্জিল এ সাক্ষ্যই দেয়। সারা রাত মসীহ্র সকাতর ও বেদনাত্মক দোয়া কি রদ হতে পারতো? মসীহ্র এ কথা বলা যে, ইউনুসের ন্যায় তিন দিন পর্যন্ত কবরে থাকবে– এর কি এ অর্থ হতে পারে যে, সে মৃতাবস্থায় কবরে থাকলো? ইউনুস কি মাছের পেটে তিন দিন মৃতাবস্থায় থেকে ছিলেন? পিলাতের স্ত্রীর স্বপ্নের দ্বারা কি খোদার এ উদ্দেশ্য প্রতীয়মান হয় না যে, মসীহ্কে সে যেন ক্রুশের মৃত্যু থেকে রক্ষা করে? তেমনিভাবে, শুক্রবার শেষ বেলায় মসীহ্কে ক্রুশে দেওয়া ও সন্ধ্যার পূর্বেই নামিয়ে ফেলা এবং পূর্ব থেকে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তিন দিন পর্যন্ত তাঁকে ক্রুশে ঝুলিয়ে না রাখা, তাঁর হাড়গোড় না ভাঙ্গা ও (তাঁর দেহ থেকে) রক্ত বের হওয়া এ যাবতীয় বিষয় কি উচ্চস্বরে বলছে না, এসব উপায়-উপকরণ মসীহ্র প্রাণ রক্ষার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছিল? বস্তুত দোয়া করার সাথে সাথে রহমতের এ সকল উপকরণ বাস্তব রূপ ধারণ করে। আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত বান্দার সারা রাত কেঁদে কেঁদে করা দোয়াও কি কখনও রদ হতে পারতো? তারপর, ক্রুশের ঘটনার পর হাওয়ারী (শিষ্য)-দের সাথে মসীহ্র দেখা করা ও তাঁর দেহের ক্ষতগুলো দেখানো এ কথার স্বপক্ষে কত শক্তিশালী প্রমাণ যে, তিনি ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মরেন নি! যদি তা সত্য না হয়ে থাকে তাহলে মসীহ্কে ডাকো তো দেখি তিনি যেন এসে তোমাদের সাথে দেখা করেন, যেমন তিনি হাওয়ারীদের সাথে দেখা করেছিলেন! মোট কথা, সকল দিক দিয়ে প্রমাণিত যে, ক্রুশীয় মৃত্যু থেকে মসীহ্র প্রাণ রক্ষা করা হয় এবং তিনি ভারতবর্ষে আসেন। কেননা বনী ইসরাঈলের দশটি গোত্র এসব দেশেই চলে এসেছিল যারা পরিশেষে মুসলমান হয়ে*

শুধু মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। সে ঐ বিজ্ঞাপনে লিখেছে যে, এ ব্যক্তির অর্থাৎ এ অধমের কোনও ভবিষ্যদ্বাণী নাকি পূর্ণ হয় নি। এর উত্তরে আমরা এছাড়া আর কী-ই-বা বলতে পারি: لعنة الله على الكاذبين **'লানাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন'** (মিথ্যাবাদীদের ওপর আল্লাহ্‌র লা'নত বর্ষিত হোক)। সে এ-ও বলে যে, আথম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নি। আমরা এর উত্তরেও لعنة الله على الكاذبين **'লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন'** ছাড়া কিছু বলতে পারি না। আসলে যখন মানুষের অন্তর কার্পণ্য ও বিদ্বেষের দরুন অন্ধ হয়ে যায় তখন সে দেখেও দেখে না, শুনেও শুনে না। তার হৃদয়ের ওপর খোদার মোহর লেগে যায়। তার কানের ওপরে পর্দা পড়ে যায়। একথা এ যাবৎ কার নিকটই-বা গোপন আছে যে, আথম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী শর্তযুক্ত ছিল এবং খোদার ইলহামে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, সে সত্যের দিকে ঝুঁকে যাওয়ার অবস্থায় নির্ধারিত মেয়াদের ভেতর মৃত্যু থেকে বেঁচে যাবে! অতঃপর আথম তার কার্য কলাপ দ্বারা, তার কথা বার্তার দ্বারা, তার ভয়ে কাতর হয়ে পড়ার অবস্থার দ্বারা, তার কসম না খাওয়ার দ্বারা এবং সরকারের নিকট নালিশ না করার দ্বারা প্রমাণ করে দিয়েছিল যে, ভবিষ্যদ্বাণীর (নির্ধারিত) দিনগুলোতে তার অন্তর খ্রীষ্টধর্মের বিশ্বাসে কায়েম থাকে নি। ইসলামের মাহাত্ম্য ও আযমত তার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়। এরূপ হওয়া অসম্ভবের কিছু ছিল না, কেননা সে মুসলমানেরই সন্তান ছিল। কোন কোন স্বার্থের জন্য সে ইসলাম ছেড়ে দিয়ে মুর্তাদ (ধর্মত্যাগী) হয়েছিল। ইসলামী আদর্শের ছোঁয়া ও এর স্বাদ তার অন্তরে নিহিত ছিল, সেজন্যই খ্রীষ্টানদের আকীদার (বিশ্বাসের) সাথে সে পুরোপুরি একমত ছিল না। আর আমার সম্পর্কে সূচনালগ্ন থেকেই সুধারণা পোষণ করতো। অতএব ইসলামী ভবিষ্যদ্বাণীর কারণে তার ভীত হওয়া যুক্তিসঙ্গত ও বোধগম্য ছিল। তারপর যখন সে কসম খেয়ে নিজেকে খ্রীষ্টান বলে প্রমাণ

যায়। তারপর ইসলাম গ্রহণের পর তওরাতের ওয়াদা অনুযায়ী তাদের মধ্যে কয়েকজন বাদশাহ্‌ও হয়েছেন। এটা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নবুওয়তের সত্যতার স্বপক্ষে এক দলিল বিশেষ। কেননা তওরাতে ওয়াদা ছিল, বনী ইসরাঈল প্রতিশ্রুত নবীর অনুসারী হয়ে ক্ষমতা ও রাজত্ব পাবে। মোট কথা, মসীহ ইবনে মরিয়মকে ক্রুশীয় মৃত্যুতে মেরে ফেলা এ এমন এক ভিত্তি ছিল, যার ওপরে খ্রীষ্টধর্মের যাবতীয় মূলনীতি প্রায়শ্চিত্তবাদ ও ত্রিত্ববাদ ইত্যাদির ভিত রচনা করা হয়েছিল। আর এটাই সে ধারণা যা খ্রীষ্টানদের (তৎকালীন অনুবাদক) চল্লিশ কোটি মানুষের হৃদয়ে ঢুকে গেছে। এটা ভ্রান্ত প্রমাণিত হলে খ্রীষ্টধর্মের কোন ভিত্তিই থাকে না। যদি খ্রীষ্টানদের মধ্যে কোন সম্প্রদায় ধর্মীয় অনুসন্ধানের উদ্দীপনা পোষণ করে তাহলে উল্লেখিত প্রমাণগুলো সম্পর্কে অবহিত হওয়ার দরুন তারা শীঘ্রই খ্রীষ্টধর্মকে বিদায় সম্ভাষণ জানাবে। আর যদি এ অনুসন্ধানের আগুন ইউরোপের সমস্ত হৃদয়ে জ্বলে ওঠে তাহলে চল্লিশ কোটি মানুষের যে জনগোষ্ঠী

করলো না, এবং (সরকারের নিকট) নালিশও করলো না, বরং চোরের ন্যায় ভয় করতে থাকলো আর খ্রীষ্টানদের শক্তভাবে চাপ দেওয়া সত্ত্বেও উল্লেখিত কাজগুলোর জন্য যখন সে সম্মত হলো না তখন তার ভূমিকা কি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে স্পষ্টতঃ সাক্ষ্য দিচ্ছে না যে, ইসলামী ভবিষ্যদ্বাণীর মাহাত্ম্যের প্রভাবে নিশ্চয় সে ভয় পেতে থাকে? উদাসীন জীবন-যাপনকারী লোকেরা তো জ্যোতির্বিদের ভবিষ্যদ্বাণীর দরুনও ভয় পেয়ে যায়। অতএব ঐরূপ ভবিষ্যদ্বাণীর কী তুলনা হতে পারে যা অত্যন্ত জোরালোভাবে করা হয়েছিল, যা শুনা মাত্র তখনই তার চেহারা ফেকাসে হয়ে গিয়েছিল! সেই সাথে এই ওয়াদা করা হয়েছিল যে, ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ না হলে আমাকে যেন শাস্তি দেওয়া হয়। অতএব এর প্রতাপ কী করে এমন লোকের হৃদয়কে প্রভাবিত করতো না, যে সত্যতার আলো থেকে বঞ্চিত? অতঃপর এ ব্যাপারটি কেবল অনুমানস্বরূপই ছিল না, বরং তার ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ার অবস্থাকে শত শত লোকে দেখেছিল এবং আথম নিজে তার অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা ও বিশ্বাসের পরিবর্তনকেও প্রকাশ করে দিল। অতঃপর মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পর কসম না খাওয়ার এবং নালিশ না করার মাধ্যমে সে তার মানসিক পরিবর্তনের অবস্থাকে আরও সুস্পষ্ট ও নিশ্চিত পর্যায়ে পৌঁছে দিল। তারপর খোদার ইলহাম অনুযায়ী সে আমার সর্বশেষ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ছয় মাসের মধ্যে মারাও গেল। অতএব এ যাবতীয় ঘটনা কি প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ ও খোদাভীরু ব্যক্তির হৃদয়কে এ দৃঢ়-বিশ্বাসে ভরে দেয় না যে, আথম ভবিষ্যদ্বাণীর মেয়াদকালে ইলহামী শর্তকে কাজে লাগিয়ে জীবিত থাকে? তারপর ঘোষণাকৃত ঐশীবাণীর সংবাদ অনুযায়ী সত্যের স্বাক্ষ্যকে গোপন রাখার দরুন মারা যায়। দেখ, তালাশ (অনুসন্ধান) কর সে এখন কোথায়! এবং জীবিত আছে কি? এ কি সত্য নয় যে, সে কয়েক বছর পূর্বে মারা গেছে কিন্তু যার অর্থাৎ এই অধমের সাথে অমৃতসরে ড. মার্টিন ক্লার্কের বাসভবনে বিতর্ক করেছিল সে এখনও জীবিত, যে

উনিশ শ' বছরে তৈরী হয়েছে তা যথাসম্ভব উনিশ মাসের ভেতর অদৃশ্য হাতের ছোঁয়ায় সহসা পাল্টা খেয়ে মুসলমান হয়ে যেতে পারে। কেননা ক্রুশীয় মৃত্যুর আকীদা/বিশ্বাসের পর এটা প্রমাণ হয়ে যাওয়া যে, মসীহ্ ক্রুশে মারা যান নি বরং অন্যান্য দেশে ভ্রমণ করতে থাকেন এটা এরূপ এক বিষয় যা নিমিষেই খ্রীষ্টীয় আকীদা বা বিশ্বাসকে অন্তর থেকে উধাও করে দেয় ও খ্রীষ্টান জগতে মহা বিপ্লব ঘটায়।

*হে প্রিয়গণ! এখন খ্রীষ্টধর্মকে ছেড়ে দাও, কেননা খোদা **প্রকৃত সত্যকে দেখিয়ে দিয়েছেন**। ইসলামের আলোর মধ্যে আস, যাতে নাজাত ও পরিত্রাণ লাভ করতে পার। সর্বজ্ঞ খোদা জানেন, এ সকল উপদেশ নেক ও পবিত্র নিয়্যতে পরিপূর্ণ তথ্যানুসন্ধানের পর প্রদান করা হচ্ছে।*

প্রবন্ধটি লিখছে? হে যারা লাজশরমের ধার ধারো না! একটু চিন্তা করে দেখ, সাক্ষ্যকে গোপন করার পরে সে কেন শীঘ্র মরে গেল।

আমি তো তার জীবদ্দশায় এ-ও লিখে দিয়েছিলাম যে, আমি যদি মিথ্যাবাদী হই তাহলে আমি প্রথমে মারা যাব। নচেৎ আমি আথমের মৃত্যুকে দেখবো। অতএব যদি তোমাদের লজ্জা-শরম থাকে তাহলে আথমকে খোঁজ, সে কোথায়!

সে প্রায় আমার সমবয়সী ছিল এবং ত্রিশ বছর কাল ধরে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় রাখতো। যদি আল্লাহ চাইতেন আরও ত্রিশ বছর পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারতো। অতএব কী কারণে সে ঐ সময়েই যখন সে খ্রীষ্টানদের মনস্তুষ্টির জন্য ইলহামী (ঐশী) ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা এবং সত্যের দিকে মানসিকভাবে তার ঝুঁকে যাওয়াকে লুকালো, তখন খোদার ইলহাম (ঐশীবাণী) অনুযায়ী সে মরে গেলো? খোদা তাআলা ঐ সকল মানবহৃদয়ের ওপর অভিসম্পাত করেন যারা সত্যকে বুঝার ও পাওয়ার পরও তা অস্বীকার করে। আর যেহেতু এই অস্বীকার, যা অধিকাংশ খ্রীষ্টান এবং কিছু সংখ্যক অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত মুসলমানেরা করেছে তা খোদা তাআলার দৃষ্টিতে প্রকাশ্য যুলুম ছিল, সেহেতু তিনি অপর একটি মহান ভবিষ্যদ্বাণীকে পূরো করে দেখাবার মাধ্যমে অর্থাৎ পণ্ডিত লেখরামের মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার দ্বারা অস্বীকারকারীদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে দেন। এ ভবিষ্যদ্বাণীটি এমন পর্যায়ের অলৌকিকতাপূর্ণ ছিল যে, এতে সময়ের পূর্বেই অর্থাৎ পাঁচ বছর পূর্বে বলে দেওয়া হয়েছিল যে, লেখরাম কোন্ দিন ও কীভাবে মারা যাবে। কিন্তু আফসোস! সংকীর্ণমনা লোকেরা যাদের মৃত্যুর কথা স্মরণ নেই, তারা এ ভবিষ্যদ্বাণীটিকেও গ্রহণ করে নি। খোদা তাআলা আরো বহু সংখ্যক নিদর্শন দেখিয়েছেন, কিন্তু তা সবই এরা অস্বীকার করে। এখন ২১ নভেম্বর, ১৮৯৮-র বিজ্ঞপ্তিটি হচ্ছে এক চূড়ান্ত ফয়সালা। প্রত্যেক সত্যান্বেষীর উচিত, ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করা। খোদা তাআলা মিথ্যাবাদী এবং কাযযাব ও দাজ্জালদেরকে সাহায্য করেন না। কুরআন করীমে সুস্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে যে, খোদা তাআলা মু'মিনদেরকে ও রসূলদেরকে জয়যুক্ত করেন। এটা তাঁর অঙ্গীকার। এখন এ ব্যাপারটি নিষ্পত্তির জন্য আসমানে রয়েছে। পৃথিবীর বুকে চিল্লালে, চিৎকার চেঁচামেচিতে কিছু হবে না। উভয় পক্ষ (বা দল) তাঁর দৃষ্টির সামনে রয়েছে। অচিরেই সুস্পষ্টতঃ প্রকাশ পাবে, তার সাহায্য ও সমর্থন কার জন্য অবতীর্ণ হয়।

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُلِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى

'ওয়া আখেরু দা'ওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামীন, ওয়াস্‌সালামু আলা মানিত্তাবাআল হুদা (-আমাদের শেষ ঘোষণা এই যে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই। এবং হেদায়াতকে যে অনুসরণ করে তার জন্য শান্তি)।

ঘোষণাকারী

মির্যা গোলাম আহ্‌মদ

কাদিয়ান, ৩০শে নভেম্বর, ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ

কাশ্মীরের অধিবাসী মৌলবী আব্দুল্লাহ্ সাহেবের চিঠি

[সর্বসাধারণের উপকারার্থে হযরত ঈসা (আ.)-এর
মাযারের নকশাসহ পত্রটি এখানে প্রকাশ করা গেল]

বিনীত বান্দা আব্দুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ব-খিদমত হুযূর আকদস মসীহ্ মাওউদ, আসসালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। হযরত আকদস! এ অধম আপনার আদেশ মোতাবেক শ্রীনগরে ঘটনাস্থলে অর্থাৎ শাহ্‌যাদাহ্ ইয়োয আসফ নবীউল্লাহ্ (আ.)-এর মাযার শরীফে পৌঁছে যথাসম্ভব সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে তথ্যানুসন্ধান করেছি, বয়স্ক ও বয়ঃবৃদ্ধ বুযূর্গদের কাছেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছি এবং খাদিমদের ও আশ-পাশের লোকদের কাছেও প্রত্যেক আঙ্গিকে প্রশ্ন করে তথ্য সংগ্রহ করেছি।

হুযূর আকদস! অনুসন্ধানে আমি জানতে পেরেছি যে, এটি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র নবী ইয়োয আসফের (আ.) মাযার এবং মুসলমানদের মহল্লায় অবস্থিত। কোন হিন্দুর এখানে বসতি নেই, আর এ জায়গায় হিন্দুদের কোন সমাধিও নেই। বিশ্বস্ত লোকদের সাক্ষ্যের দ্বারা এ-ও প্রমাণিত হয়েছে যে, ঊনিশ শ' বছর ধরে এ মাযারটি রয়েছে এবং মুসলমানরা একে অত্যন্ত সম্মান ও ভক্তির দৃষ্টিতে দেখে ও এর যিয়ারত করে থাকে। সর্বসাধারণের বিশ্বাস, এ মাযারটিতে একজন মহান পয়গম্বর (নবী) সমাহিত আছেন যিনি কাশ্মীরে অন্য কোনো দেশ থেকে মানুষকে উপদেশ বাণী শুনাবার জন্য এসেছিলেন এবং বলা হয় এ নবী আমাদের নবী করীম (স.)-এর ছয়শ' বছর পূর্বে গত হয়েছেন। তবে এ বিষয়টি এখনও উদ্‌ঘাটিত হয় নি যে, এ দেশে তিনি কেন* এসেছিলেন। কিন্তু

** টীকা : সেই নবী যিনি আমাদের নবী করীম (স.)-এর ছয় শ' বছর পূর্বে গত হয়েছেন তিনি হচ্ছেন হযরত ঈসা (আ.), অন্য কেউ নয়। ইউসূ (হিব্রু ভাষায় হযরত ঈসার নাম) শব্দটির আকৃতি বদলে গিয়ে 'ইয়োয আসফ' হয়ে যাওয়া অতি সহজেই বুঝা যায়। কেননা 'ইউসূ' শব্দটিকে ইংরেজী ভাষায়ও 'জেযায' (Jesus) বানিয়েছে তখন 'ইয়োয আসফ' নামটিতে জেযায- এর চেয়ে খুব বেশি একটা পরিবর্তন হয়নি। এ শব্দটির সংস্কৃত ভাষার সাথে আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। এটি সুস্পষ্টতঃ হিব্রু বলেই প্রতীয়মান হয়। হযরত ঈসা (আ.) এদেশে কেন এসেছিলেন তার কারণও সুস্পষ্ট। তা এই যে, সিরিয়ার ইহুদীরা তাঁর তবলীগকে যখন গ্রহণ করলো না এবং তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করতে চাইলো তখন খোদা তাআলা তার ওয়াদা অনুযায়ী, আর তেমনি হযরত ঈসার দোয়া কবুল করে তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে নিহত হওয়া থেকে রক্ষা করলেন। অতঃপর ইঞ্জিলে যেমন লেখা আছে যে, হযরত ঈসার (আ.) ইচ্ছা ছিল তিনি ঐ ইহুদীদেরকেও বাণী পৌঁছাবেন যারা নবুখদনিৎসরের ঘটানো বিপর্যয়ের সময়ে ভারতের বিভিন্ন এলাকায় চলে*

এ সকল ঘটনা ও তথ্যাদি অবশ্যই সুপ্রমাণিত এবং এ বুযূর্গ যার নাম কাশ্মীরের মুসলমানরা ইয়োয আসফ দিয়েছে তিনি যে একজন নবী এবং শাহ্যাদাহ্ তা বিপুল সাক্ষ্য-সাবুদের মাধ্যমে চূড়ান্ত বিশ্বাসের স্তরে উপনীত। এদেশে হিন্দুদের কোনও উপাধিতে তিনি খ্যাত নন, যেমন রাজা বা অবতার, ঋষি, মুনি বা সিদ্ধ ইত্যাদি। বরং সর্বসম্মতভাবে সবাই তাকে নবী বলেন। নবী শব্দটি মুসলমান ও ইসরাঈলীদের মধ্যে এক ও অভিন্ন একটি শব্দ। আর যে ক্ষেত্রে কোন নবী আমাদের নবী করীম (স.)-এর পরে আসেন নি, আসতে পারতেনও না, সেজন্য কাশ্মীরের সাধারণ মুসলমান সর্বসম্মতভাবে এটাই বলে, এ নবী ইসলামের পূর্বের কোন নবী। তবে তারা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেন নি যে, তিনি একজন ইসরাঈলী নবী। নবী শব্দটি যেহেতু কেবল দু'টি জাতি অর্থাৎ মুসলমান ও বনী ইসরাঈলের নবীদের জন্যই অভিন্নরূপে প্রচলিত আর ইসলামে আঁ হযরত

এসেছিল। অতএব এই উদ্দেশ্য সফলের জন্যই তিনি এ দেশে এসেছিলেন।

ফ্রেঞ্চ গবেষক ড. বার্ণিয়ের (Dr. Bernier) তার প্রণীত Travels (সফর বৃত্তান্ত) গ্রন্থে লিখেছেন, 'বহু ইংরেজ গবেষক অতি জোরালোভাবে এ রায় প্রকাশ করেছেন যে, কাশ্মীরের মুসলমান অধিবাসীরা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে বনী ইস্রাঈল, যারা বিপর্যয়ের সময়ে এ দেশে এসেছিল। তাদের অবয়ব, চেহারার আকৃতি, পোষাক-আশাক, লম্বা কুর্তা এবং কোন কোন প্রথা ও রীতিনীতি এর সাক্ষ্য দেয়।' অতএব অতি সহজেই ধারণা করা যায়, হযরত ঈসা (আ.) সিরিয়ার ইহুদীদের সম্পর্কে নিরাশ হয়ে এদেশে তাঁর জাতির লোকদের নিকট তবলীগ পৌঁছাবার উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। সম্প্রতি যে রুশ পর্যটক একখানা ইঞ্জিল আবিষ্কার করেছেন (খুঁজে পেয়েছেন) যা আমি লন্ডন থেকে আনিয়েছি, সেটিও এ রায়ে আমাদের সাথে একমত যে, নিশ্চয় হযরত ঈসা (আ.) এ দেশে এসেছিলেন। আর কোন কোন গ্রন্থকার 'ইয়োয আসফ' নবীর যে জীবন-বৃত্তান্ত ও ঘটনাবলী লিখেছেন, ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও যেগুলোর অনুবাদ ছড়িয়ে পড়েছে সেগুলো পাদ্রী সাহেবানও পাঠ করে অত্যন্ত হতবাক হচ্ছেন। কেননা (এতে বর্ণিত) ঐ শিক্ষাগুলোর ইঞ্জিলের নৈতিক শিক্ষার সাথে অনেক মিল রয়েছে, বরং বেশির ভাগ বাক্যই কাকতালীয় ব্যাপার মনে হয়। তেমনিভাবে তিব্বতীয় সুসমাচারের প্রচলিত ইঞ্জিলের সাথে অনেক কাকতলীয় মিল রয়েছে। অতএব এ সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ এমন নয় যে কোন ব্যক্তি শত্রুতা মূলক জোর খাটিয়ে নিমিষে উড়িয়ে দিতে পারে। বরং এগুলোতে সত্যতার আলো সুস্পষ্ট দেখা যায়। এগুলো এমন তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিতবহ সাক্ষ্য প্রমাণ, যা এক সাথে একত্রে দেখায় এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয় যে, এ কোন ভিত্তিহীন গাল-গল্প নয়। ইয়োয আসফ নামটি হিব্রু ভাষার সাথে মিল থাকা এবং 'ইয়োয আসফ' নামটির নবী বলে প্রসিদ্ধি লাভ করা যা এমন একটি শব্দ যা কেবল ইসরাঈলী ও ইসলামী নবীদের জন্যই বলা হয়, তারপর ঐ নবীর সাথে শাহ্যাদাহ্ শব্দটির যোগ হওয়া অতঃপর এ নবীর গুণাবলী হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথে অবিকল সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া, তাঁর শিক্ষা ইঞ্জিলের নৈতিক শিক্ষার অবিকল অনুরূপ হওয়া, তদুপরি মুসলমানদের মহল্লায় তাঁর সমাহিত হওয়া, এ মাযারের সময়কাল উনিশ শ' বছর বলে বর্ণিত হওয়া, অতঃপর এ যুগে একজন ইংরেজ কর্তৃকও একটি তিব্বতী ইঞ্জিলের ভাষ্যের সন্ধান পাওয়া এবং ঐ ইঞ্জিল থেকে সুস্পষ্টত প্রমাণিত

(স.) এর পর কোন নবী আসতে পারেন না, সেহেতু আবশ্যকীয়ভাবে তিনি হলেন ইসরাঈলী নবী- এটাই সুনির্দিষ্ট হলো। কেননা তৃতীয় কোন ভাষায় এ শব্দটির ব্যবহার নেই। নিঃসন্দেহে কেবল দু'টি ভাষায় এবং দু'টি জাতির মধ্যেই এর অভিন্নতা সীমাবদ্ধ।* কিন্তু খতমে নবুওয়তের কারণে মুসলমান জাতি এথেকে বেরিয়ে গেল। অতএব স্পষ্টত চূড়ান্ত কথা এই দাঁড়ালো যে, তিনি একজন ইস্রাঈলী নবী। অতঃপর ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় প্রমাণিত হয়ে যাওয়া যে এ নবী আমাদের নবী করীম (স.)-এর ছয় শ' বছর পূর্বে গত হয়েছেন তা প্রথমোক্ত যুক্তি-প্রমাণকে সন্দেহাতীত বিশ্বাসে পৌঁছে দেয় এবং প্রত্যেক সচেতন মানুষকে এ সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যায় যে, এ নবী হচ্ছেন হযরত মসীহ্ ঈসা (আ.), অন্য কেউ নয়। কেননা তিনিই সেই ইসরাঈলী নবী যিনি আঁ হযরত (স.)-এর ছয় শ' বছর পূর্বে গত হয়েছেন। তারপর তিনি শাহ্যাদাহ্ নামেও অভিহিত হয়েছেন বহুল বর্ণিত ঐতিহাসিক এ তথ্যটিতে নজর দিলে উল্লিখিত যুক্তি-প্রমাণ আলোর ওপরে আলো পড়ার ন্যায় আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কেননা এ সময়কালটিতে হযরত ঈসা (আ.) ছাড়া অন্য কোন নবী কখনও শাহ্যাদাহ্ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন নি। তারপর ইয়োয আসফ নামটির যে 'ইউসূ' (يسوع) শব্দের সাথে অনেক মিল রয়েছে তা এ যাবতীয় সুনিশ্চিত বিষয়কে আরও জোরালো করে। তারপর ঘটনাস্থলে পৌঁছলে আরেকটি প্রমাণের খোঁজ পাওয়া গেল, সংযুক্ত নকশাটি থেকে যেমন প্রকাশ পাচ্ছে। তা হলো, এ নবীর মাযারটি উত্তর দক্ষিণে অবস্থিত এবং জানা যায় যে, উত্তর দিকে রয়েছে মাথা এবং পা দক্ষিণ দিকে। আর এ দাফন পদ্ধতিটি কেবল মুসলমান ও আহ্লে কিতাবের সাথেই নির্দিষ্ট। আরেকটি আনুষঙ্গিক

হওয়া যে, হযরত ঈসা (আ.) এ দেশে আসেন– এ যাবতীয় বিষয়ের দিকে সামগ্রিকভাবে দৃষ্টি দিলে নিশ্চয় এ সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় যে, নিঃসন্দেহে হযরত ঈসা (আ.) এ দেশে (ভারতবর্ষে) এসেছিলেন এবং এখানেই (কাশ্মীরে) ইন্তেকাল করেন। এছাড়াও অনেকগুলো যুক্তি-প্রমাণ রয়েছে যা আমি আলাদা এক পুস্তকে লিখবো ইনশাআল্লাহ্- (গ্রন্থকার)

***টীকা :** অর্থাৎ নবী শব্দটি কেবল দুটি ভাষার সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত। দুনিয়ার অন্য কোন ভাষায় এ শব্দটি ব্যবহৃত হয় না। অর্থাৎ এক, হিব্রু ভাষায় নবী শব্দটি প্রচলিত। দ্বিতীয়তঃ আরবী ভাষায়। এছাড়া সারা জগতের ভাষাগুলো নবী শব্দটির সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না। অতএব এ শব্দটি যে ইয়োয আসফের জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে তা পরিচিতি-ফলকের ন্যায় সাক্ষ্য দেয় যে, এ ব্যক্তি হয়তো ইসরাঈলী নবী, নয়তো ইসলামী নবী। কিন্তু খতমে নবুওয়তের পর অন্য কোন নবী আসতে পারে না। অতএব সুনির্দিষ্টভাবে সাব্যস্ত হলো যে, ইয়োয আসফ ছিলেন ইসরাঈলী নবী। আর তাঁর যে সময়কাল বলা হয়েছে এর পরিপ্রেক্ষিতে অকাট্যভাবে সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় তিনিই হযরত ঈসা (আ.)। তাঁকেই শাহ্যাদাহ্ নামেও অভিহিত করা হয়েছে। -গ্রন্থকার*

প্রমাণ (Side evidence) হচ্ছে এ কবরস্থানের সংলগ্ন অল্প কিছু দূরে একটি পাহাড় 'কোহে সোলেমান' নামে প্রসিদ্ধ। এ নাম থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কোন ইসরাঈলী নবী এ জায়গায় এসেছিলেন*। এ শাহ্যাদাহ্ নবীকে হিন্দু সাব্যস্ত করা নিতান্তই অজ্ঞতা। এটা এমন একটা ভুল যা এ সকল সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণকে সামনে রেখে তা খণ্ডন করার প্রয়োজন নেই। সংস্কৃত ভাষায় কোথাও নবী শব্দটির ব্যবহার নেই। বরং এ শব্দটি হিব্রু ও আরবী ভাষার সাথে নির্দিষ্ট এবং দাফন করা হিন্দুদের রীতি নয়। হিন্দুরা তো তাদের মৃতদেরকে পোড়ায়। অতএব কবরের আকার আকৃতিও অকাট্যভাবে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে, এটা বনী ইস্রারাঈলী। কবরটির পাশেই পশ্চিম দিকে একটি ছিদ্র রয়েছে। মানুষে বলে, এ ছিদ্র দিয়ে অতি উত্তম সুগন্ধ আসতো। এ ছিদ্রটি বেশ প্রশস্ত এবং কবরের ভেতর পর্যন্ত বিস্তৃত। সেজন্য নিশ্চিত ধারণা করা হয়, কোন বড় উদ্দেশ্যে এটি রাখা হয়েছে। যথাসম্ভব স্মৃতিফলকস্বরূপ এতে কোন জিনিস পুঁতে রাখা হয়েছে। জনসাধারণের মতে এতে কোন রত্নভান্ডার আছে। কিন্তু এ ধারণাটি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। তবে যেহেতু কবরগুলোতে ছিদ্র রাখার কোন দেশের রীতি নীতি নেই সেহেতু এথেকে মনে করা হয় যে, এ ছিদ্রটিতে কোন গুরুত্বপূর্ণ ও মহান রহস্য আছে। শত শত বছর ধরে এ ছিদ্রটির চলে আসা– এটা আরও আশ্চর্যজনক ব্যাপার। এ শহরের শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরাও বলেন, এটি কোন নবীর কবর, যিনি অন্য কোন দেশ থেকে পর্যটকরূপে এসেছিলেন এবং তাঁকে শাহ্যাদাহ্ উপাধি দেয়া হয়েছিল। শিয়ারা আমাকে একটি কিতাবও দেখিয়েছিলেন যার নাম হচ্ছে **'আইনুল হায়াত'**। এ বইটিতে **১১৯** পৃষ্ঠায় বেশ কিছু কেসসা-কাহিনী ইবনে বাবওয়ায় এবং কামালুদ্দিন ও ইত্মামুন নি'মাত গ্রন্থদ্বয়ের বরাতে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু এ সবগুলোই আজে-বাজে গাল-গল্প। এ কিতাবটিতে কেবল এটুকু সত্য তথ্য রয়েছে যে, গ্রন্থকার স্বীকার করেন, ইয়োয আসফ একজন পর্যটক নবী ছিলেন এবং শাহ্যাদাহ্ ছিলেন যিনি কাশ্মীরে এসেছিলেন। এই শাহ্যাদাহ্ নবীর মাযারের ঠিকানা হচ্ছে, জামে মসজিদ থেকে যখন রওযা বাল ইয়ামীনের রাস্তায় আসবেন, তখন একটু সামনেই এই মাযার পাবেন। এ কবরস্থানের বাঁ দিকের দেয়ালের পেছনে একটা রাস্তা আছে এবং ডান দিকে একটি পুরানো মসজিদ রয়েছে। মনে হয় তাবারুক-স্বরূপ পুরাণ কালে এই মাযার শরীফের নিকটে মসজিদ

** **টীকা** ঃ সোলায়মান বলতে সোলায়মান নবীকে বুঝায় তা জরুরী নয়, বরং প্রতীয়মান হয় যে, কোন ইস্রাঈলী আমীর হতে পারেন যার নামে পাহাড়টি প্রসিদ্ধি পেয়েছে। ঐ আমীরের নাম সোলেমান হতে পারে। নবীদের নামে এখনও নাম রাখার রীতি ইহুদীদের মাঝে প্রচলিত রয়েছে। মোটকথা, এ নামটি থেকেও এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইহুদীদের গোত্র কাশ্মীরে এসেছিল যাদের জন্য হযরত ঈসা (আ.)-এর কাশ্মীরে আগমন জরুরী ছিল -গ্রন্থকার*

নির্মাণ করা হয়েছিল। এ মসজিদটির সংলগ্ন মুসলমানদের বাড়ী-ঘর রয়েছে। অন্য কোন জাতির সেখানে কোন নাম-গন্ধ নেই। আল্লাহ্‌র এই নবীর কবরের ডান কোনায় একটা পাথর রাখা আছে যাতে মানুষের পায়ের ছাপ আছে। কথিত যে, এটা রসূলের পায়ের ছাপ। যথাসম্ভব ঐ শাহ্‌যাদাহ্ নবীরই পায়ের এ ছাপ চিহ্নরূপে রয়ে গেছে। এ কবরটিতে কোন কোন গোপন রহস্যের প্রকৃত স্বরূপকে হাতছানি দেয় এমন দু'টি বিষয় রয়েছে। এক, সেই ছিদ্র-পথ যা কবরটির পাশে বিদ্যমান। দুই, ঐ পায়ের ছাপ যা পাথরের ওপর রয়েছে। মাযার সম্পর্কিত বাদবাকি তথ্য মাযারের সংযুক্ত নকশাটিতে দেখানো হয়েছে। ইতি-

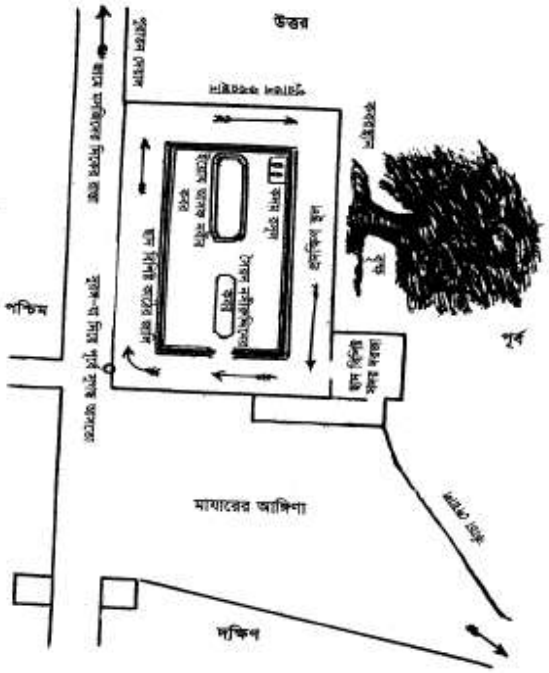

হযরত ঈসা (আ.) যিনি ইউসূ, যীষূ ও যেযাস এবং ইয়োয আসফ নামেও খ্যাত এটি তাঁর মাযার এবং কাশ্মীরের বয়োবৃদ্ধ লোকদের সাক্ষ্য অনুযায়ী প্রায় উনিশ শ' বছর ধরে এ মাযারটি শ্রীনগরে খান ইয়ার মহল্লায় অবস্থিত।

উপসংহার

খোদা তাআলার অনুগ্রহে বিরুদ্ধবাদীদেরকে লাঞ্ছিত করার জন্য এবং এ গ্রন্থকারের সত্যতা প্রকাশার্থে এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে যে, কাশ্মীরের শ্রীনগরে খান ইয়ার মহল্লায় ইয়োয আসফের নামে যে কবর রয়েছে তা নিঃসন্দেহে হযরত ঈসা (আ.)-এর কবর। হযরত ঈসার (আ.) ক্ষতস্থানে ব্যবহৃত যে মলমটি **'মরহমে ঈসা'** নামে রয়েছে যার সম্পর্কে হাকিমী চিকিৎসা শাস্ত্রের এক হাজার বরং এরও অধিক সংখ্যক গ্রন্থ সাক্ষ্য দিচ্ছে, তা এ কথার প্রথম প্রমাণ যে, হযরত মসীহ্ (আ.) ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে নিহত হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। তিনি ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে কখনও মারা যান নি। এ মলমের বিবরণ দিতে গিয়ে চিকিৎসাবিদগণ সুস্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন, 'এ মলমটি আঘাত ও পতন জনিত কাটা-ছেঁড়া এবং প্রত্যেক প্রকারের ক্ষতের জন্য তৈরী করা হয় এবং হযরত ঈসা (আ.)- এর ক্ষতগুলোর জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছিল অর্থাৎ ঐ জখমের জন্য যা তাঁর হাতে ও পায়ে ছিল'। এ মলমটির প্রমাণস্বরূপ আমার নিকট চিকিৎসাশাস্ত্রের কিছু সংখ্যক এমন পাণ্ডুলিপিও রয়েছে যা প্রায় সাত শ' বছর পূর্বের। এ চিকিৎসাবিদগণ কেবল মুসলমানদের মধ্য থেকেই নন, বরং তাদের মধ্যে খ্রীষ্টান, ইহুদী ও মজুসী (অগ্নি উপাসক পার্সি)-গণও রয়েছেন। তাঁদের প্রণীত গ্রন্থগুলো এখনও মজুদ রয়েছে। রোমক সম্রাট সিজারের গ্রন্থাগারেও রোমান ভাষায় একটি 'কারবাদীন' (ঔষধাদির ব্যবস্থাপত্র সম্বলিত গ্রন্থ)-ছিল। ক্রুশের ঘটনার পর দু'শ বছরের মধ্যে অধিকাংশ গ্রন্থ দুনিয়াতে প্রকাশ ও বিস্তার লাভ করেছিল।

হযরত ঈসা (আ.) যে ক্রুশে মারা যান নি এ বিষয়টির ভিত্তি প্রথমতঃ স্বয়ং ইঞ্জিল, যেমন পূর্বে আমরা বর্ণনা করে এসেছি। তারপর জ্ঞানমূলক গবেষণার আকারে **'মরহমে ঈসা'** এর প্রমাণ দেখিয়ে দিয়েছে। এরপর সম্প্রতি তিব্বত থেকে যে ইঞ্জিল পাওয়া গিয়েছে সেটি পরিষ্কার সাক্ষ্য দিয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.) সুনিশ্চিত ভারতবর্ষে আসেন। অতঃপর আরও অনেক কিতাব থেকে এ ঘটনার সত্যতা জানা গিয়েছে। প্রায় দু'শ বছর পূর্বের রচিত গ্রন্থ **'তারিখে-কাশ্মীর উয্‌মা'**-এর ৮২ পৃষ্ঠায় লেখা আছেঃ 'সৈয়্যদ নাসীরুদ্দিনের মাযারের নিকট যে অন্য একটি কবর রয়েছে এর সম্পর্কে সাধারণ বিশ্বাস, এটি একজন নবীর কবর'। অতঃপর সে একই ইতিহাসবিদ উক্ত পৃষ্ঠাতেই লেখেন : 'একজন শাহ্‌যাদাহ্ অন্য কোন দেশ থেকে কাশ্মীরে এসেছিলেন। তিনি খোদাভীরুতা ও পবিত্রতায়, ইবাদতে ও আত্মবিলীনতায় পূর্ণাঙ্গ স্তরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি খোদার পক্ষ থেকে নবীই ছিলেন। কাশ্মীরে এসে তিনি কাশ্মীরিদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানাতে ব্যাপৃত হন, তাঁর নাম 'ইয়োয আসফ'। অধিকাংশ দিব্যদর্শন (কাশ্‌ফ)

লাভকারীগণ বিশেষতঃ মুল্লা ইনায়াতুল্লাহ্–যিনি এ লেখকের পীর ও মুর্শেদ তিনি বলে গেছেন,'এ কবর থেকে নবুওয়তের কল্যাণ ও আশিস প্রকাশিত হচ্ছে'। এ উদ্ধৃতিটি ফার্সী ভাষায় রচিত গ্রন্থ **'তারিখে উযমা'**তে রয়েছে। এর তরজমা দেওয়া হলো। তেমনি **'মোহামেডান এঙ্গলো ওরিয়েন্টাল কলেজ ম্যাগাজিন'** সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬ইং ও অক্টোবর ১৮৯৬ইং সংখ্যায় নেযাম হায়দ্রাবাদের সেনাবাহিনীর সার্জন মির্যা সাফদার আলী সাহেব প্রণীত কিতাব **'শাহ্যাদাহ্ ইউয আসফ'** এর-ওপর পর্যালোচনাস্বরূপ লিখেছে : 'ইয়োয আসফের প্রসিদ্ধ জীবন-বৃত্তান্ত যা এশিয়া ও ইউরোপে অসাধারণ খ্যাতি লাভ করেছে তাতে পাদ্রীগণ সংযোজন-সংমিশ্রণ করেছেন অর্থাৎ তাতে ইয়োয আসফের জীবন-বৃত্তান্ত ও হযরত মসীহ্ ঈসার শিক্ষা ও নৈতিক গুণাবলীর মাঝে যে সাদৃশ্য রয়েছে তা হয়তো পাদ্রীরা নিজে থেকে সংযোজন করেছেন'। কিন্তু এ ধারণা নিছক সরলতা ও অজ্ঞতাপ্রসূতই বটে। কেননা সারা ভারতবর্ষে বিশেষতঃ কাশ্মীরে ইয়োয আসফের জীবন-বৃত্তান্ত প্রসিদ্ধি লাভ করার পরই পাদ্রীরা তা জানতে পেরেছেন। এছাড়াও এদেশের প্রাচীণ গ্রন্থাবলীতে সেগুলোর উল্লেখ রয়েছে এবং ঐ গ্রন্থগুলো আজও বিদ্যমান। কাজেই পাদ্রীদের পক্ষে তাতে সংযোজন-সংমিশ্রণ করার সুযোগ কোথায়! অনুরূপ, পাদ্রীদের এ ধারণাও সম্পূর্ণ ভুল যে, হয়তো মসীহ্র শিষ্যরা এদেশে এসে থাকবেন এবং তারাই ইয়োয আসফের জীবন-বৃত্তান্তে এগুলো লিখে গেছেন। কেননা আমরা প্রমাণ করে এসেছি যে, ইয়োয আসফ হযরত 'ইউসূ'রই নাম। যা ভাষার তারতম্যের কারণে কিছু বদলে গেছে। তদুপরি এখনও কাশ্মীরীদের অনেকে ইয়োয আসফের বদলে ঈসা-ই (আ.) বলে থাকেন, যেমন পূর্বেই লেখা হয়েছে।

وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ***'ওয়াস্সালামু আলা মানিত্তাবাআ'ল হুদা'*** (–যে ব্যক্তি সত্য পথনির্দেশনাকে অনুসরণ করে তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক)।

৩০শে নভেম্বর, ১৮৯৮ইং তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির প্রথম পৃষ্ঠা সম্পর্কিত টীকা

তাৎক্ষণিক লাঞ্ছনা

ذلتِ صادق مجو اے بے تمیز زیں رہے ہرگزنخواہی شد عزیز

শেখ মুহাম্মদ হুসেন বাটালবী বার বার এটাই বলতে থাকেন, 'সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর মাঝে পরখ করার জন্য আমরা মুবাহালা চাই। ইসলাম ধর্মে মুবাহালা রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর অনুসৃত রীতি (সুন্নত) সম্মত বটে, কিন্তু সেই সাথে এ-ও আমার আবেদন যে, আমি যদি মিথ্যাবাদী হই তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে আমার ওপর আযাব অবতীর্ণ হোক।' এর উত্তরে আমি ২১শে নভেম্বর, ১৮৯৮ইং তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে সবিস্তারে লিখে দিয়েছি যে, মুবাহালায় তাৎক্ষণিক আযাব নাযেল হওয়া সুন্নতের সম্পূর্ণ বরখেলাপ। হাদীসাবলীতে আজও لَمَّا حَلَ الْحَوْلُ (***লাম্মা হালাল হাওলু***) কথাগুলো মজুদ রয়েছে, যাতে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন, 'নাজরানের খ্রীষ্টানরা ভয় পেয়ে মুবাহালা পরিহার করেছে, কিন্তু তারা যদি আমার সঙ্গে মুবাহালা করতো তাহলে এক বছর পার হওয়ার আগেই তাদেরকে ধ্বংস করা হতো।' অতএব এ হাদীস অনুযায়ী মুবাহালার জন্য এক বছর পর্যন্তের মেয়াদকালের শর্ত হচ্ছে আঁ হযরত (স.)-এর মুখ নিঃসৃত বাণী আর এটাই মুসলমানদের জন্য সুন্নত অনুমোদিত পদ্ধতি। হাদীসে বর্ণিত ফরমানের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রেখে মুবাহালার মেয়াদকালকে এক বছরের চেয়ে কম করা উচিত নয়। বরং খোদাতাআলার সত্যপরায়ণ ও তত্ত্বদর্শী বুযূর্গ বান্দাগণ যারা পৃথিবীর বুকে হুজ্জাতুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র অকাট্য যুক্তি) স্বরূপ হয়ে আসছেন তারা সবসময়ের ন্যায় এখনও নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উত্তরাধিকারী হয়ে এ মো'জেযারও উত্তরাধিকারী। কোন খ্রীষ্টান যে ঈসা (আ.)-কে খোদা মানে*

** **টীকা** : ইঞ্জিল থেকে প্রমাণিত যে, নিদর্শন দেখানোর বরকত হযরত মসীহ্‌র যুগে খ্রীষ্টান ধর্মে বিদ্যমান ছিল, বরং নিদর্শন দেখানো সত্যিকার খাঁটি খ্রীষ্টানের পরিচয়চিহ্ন স্বরূপ ছিল। কিন্তু যখন থেকে খ্রীষ্টানরা মানুষকে খোদা বানায় ও সত্য রসূলকে (স.) প্রত্যাখ্যান করে তখন থেকে এ সকল বরকত তাদের উপর থেকে উঠে যায় এবং অন্যান্য মৃত ধর্মগুলোর ন্যায় এ ধর্মটিও মৃত হয়ে পড়ে। সে কারণেই আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোন খ্রীষ্টান নিদর্শন দেখাবার উদ্দেশ্যে দাঁড়াতে পারে না।*

অথবা অন্য কোন মুশরেক যে অন্য কোন মানুষকে খোদারূপে বিশ্বাস করে, তাদের সঙ্গে সে ব্যাপারে মুবাহালা করলে খোদা তাআলা উল্লেখিত এ মেয়াদের মধ্যে অথবা ইলহামের মাধ্যমে ইলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে জানানো অন্য কোন মেয়াদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিকে তাঁর প্রতাপ ও সত্যের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য কোন ঐশী-নিদর্শন দেখাবেন। এটা ইসলামের সত্যতার জন্য এমন চিরস্থায়ী নিদর্শনস্বরূপ অন্য কোন জাতি যার মোকাবেলা করতে পারবে না। মোটকথা, এক বছরের মেয়াদ যে ভীতি প্রদর্শনমূলক ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে এক ন্যূনতম মেয়াদকাল তা শরীয়তের সুস্পষ্ট নির্দেশাবলীর দ্বারা প্রমাণিত। আর তাৎক্ষণিকভাবে আযাব চাওয়ার হঠকারিতা কেবল সে ব্যক্তিই করতে পারে যে প্রকৃতপক্ষে হাদীসের জ্ঞান সম্বন্ধে নিতান্ত অজ্ঞ। এরূপ ব্যক্তি মৌলবী বা আলেম হওয়ার মর্যাদাকে কলঙ্কিত করে। আমি তো বাটালবী সাহেবকে বুঝাবার জন্য এ-ও লিখে দিয়েছিলাম যে, মুবাহালায় কেবল এক পক্ষ থেকে বদ-দোয়া হয় না, বরং উভয় পক্ষ থেকে বদ-দোয়া হয়ে থাকে।

অতএব কোন পক্ষ যদি নিজেকে মু'মিন মুসলমান বলে এবং অপর পক্ষকে কাফির, দাজ্জাল, ধর্মহীণ, অভিশপ্ত ও মুর্তাদ (ধর্মত্যাগী) আখ্যা দিয়ে ইসলামের গণ্ডী বহির্ভূত করে যেমন মৌলবী মুহাম্মদ হুসেন বাটালবী করে থাকেন, তাহলে কে তাকে নিজের জন্য তাৎক্ষণিক আযাবের বদ-দোয়া করতে নিষেধ করেছে? কিন্তু মুলহাম (ইলহামপ্রাপ্তির অধিকারী ব্যক্তি) তার ইচ্ছার তাবেদার হতে পারেন না। মুলহাম তো খোদা তাআলার ইলহামের তাবেদারী করবেন। কিন্তু ২১শে নভেম্বর, ১৮৯৮ তারিখে আমার যে বিজ্ঞপ্তি শেখ মুহাম্মদ হুসেন বাটালবী ও তার দুই দোসরের মুকাবিলায় মুবাহালারূপে প্রকাশিত হয়েছে তা হচ্ছে কেবল এক দোয়া যার উদ্দেশ্য শুধু এটুকু যে, মিথ্যাবাদী খোদা তাআলার পক্ষ থেকে লাঞ্ছিত হোক। এর অর্থ এ নয় যে, মিথ্যাবাদী (শীঘ্র) মরে যাক বা কোন ছাদ থেকে পড়ে যাক। যেহেতু মুহাম্মদ হুসেন, জাটলি ও তিব্বতী মিথ্যারোপ, অভিসম্পাত ও গালিগালাজের মাধ্যমে আমার লাঞ্ছনা চেয়েছে, সেজন্য আমি আল্লাহ্‌র নিকট এটাই চেয়েছি, আমি যদি প্রকৃতপক্ষে লাঞ্ছনার যোগ্য, মিথ্যাবাদী, দাজ্জাল ও লা'নতি হয়ে থাকি যেমন এসব গালমন্দের দ্বারা মুহাম্মদ হুসেন তার পত্রিকার পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ভরে ফেলেছে এবং বার বার আমাকে মন:কষ্ট দিয়েছে, তাহলে আমাকে যেন আরও অপমান করা হয় এবং শেখ মুহাম্মদ হুসেন যেন খোদা তাআলার পক্ষ থেকে সম্মান ও বড় বড় পদমর্যাদা পায়। কিন্তু আমি যদি মিথ্যাবাদী, দাজ্জাল ও অভিশপ্ত না হয়ে থাকি, তাহলে এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র দরবারে আমার ফরিয়াদ, আমার অবমাননাকারী মুহাম্মদ হুসেন, জাটলী ও তিব্বতীকে যেন আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হয়। মোটকথা, আমি খোদা তাআলার নিকট যালেম, অত্যাচারী ও মিথ্যাবাদীর লাঞ্ছনা চাই, তা

আমাদের উভয় পক্ষের যে-কেউ হোক। এর ওপরে আমি 'আমীন' পড়ছি। আমার প্রতি এ ইলহাম (ঐশীবাণী অবতীর্ণ) করা হয়েছে যে, এ দু'পক্ষের মধ্যে যে পক্ষই সত্যিসত্যি খোদা তাআলার দৃষ্টিতে যালেম ও মিথ্যাবাদী, তাকে খোদা লাঞ্ছিত করবেন। আর তা বাস্তবত: ১৫ই জানুয়ারী, ১৯০০ পর্যন্ত ঘটে যাবে। খোদা তাআলাই সবচেয়ে ভাল জানেন, তাঁর দৃষ্টিতে কে যালেম ও মিথ্যাবাদী। যদি (বেঁধে দেওয়া) এ সময়ের মধ্যে আমার লাঞ্ছনা প্রকাশ পেয়ে যায় তাহলে নিঃসন্দেহে আমার মিথ্যাবাদী, যালেম ও দাজ্জাল হওয়া প্রমাণিত হয়ে যাবে। আর এভাবে জাতির নিত্যকার ঝগড়া মিটে যাবে। পক্ষান্তরে যদি শেখ মুহাম্মদ হুসেন, জাফর জাটলী ও তিব্বতীর প্রতি আসমান থেকে (অপার্থিব উপায়ে) লাঞ্ছনা অবতীর্ণ হয়, তাহলে এটা এর অকাট্য প্রমাণ হবে যে, তারা আমাকে গালিগালাজ করাতে এবং দাজ্জাল, অভিশপ্ত ও চরম মিথ্যাবাদী বলাতে আমার প্রতি যুলুম করেছে। কিন্তু শেখ মুহাম্মদ হুসেন ২১শে নভেম্বর, ১৮৯৮ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত আমার প্রতি আরবী (ভাষায় অবতীর্ণ) ইলহামের ওপর, অর্থাৎ তাতে বর্ণিত اَتَعْجَبُ لِاَمْرِی 'আ তা'জাবু লি-আমরি' বাক্যটির ওপর যখন আপত্তি উত্থাপন করে তখন সে নিজের জন্য লাঞ্ছনার দ্বার নিজেই খুলে দেয়। অন্য কথায়, তাৎক্ষণিকভাবে তার লাঞ্ছিত হবার আকাঙ্খা সে নিজ হাতেই পূরণ করে। অথচ তার লাঞ্ছনা তো ১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৯৮ তারিখ থেকে বাস্তবায়িত হওয়া উচিত ছিল। তার আগেই সে এক লজ্জাকর লাঞ্ছনা মাথায় তুলে নিল, যাকে তাৎক্ষণিকই নয়, বরং অগ্রিম লাঞ্ছনা বলা উচিত। তা হলো এরূপে যে উক্ত শেখ উদ্ধৃত ইলহামটি দেখে কোনো এক উপলক্ষ্যে একই শহরের অধিবাসী শেখ গোলাম মুস্তাফা সাহেবের সামনে এর সম্পর্কে আপত্তি করলেন, বিজ্ঞপ্তিতে উদ্ধৃত যে ইলহামী বাক্যটি রয়েছে অর্থাৎ 'আ তা'জাবু লি-আমরি' এতে **'নাহ্‌বী'** (-আরবী ব্যাকরণগত) ভুল রয়েছে, অথচ খোদার বাণী ভুল হতে পারে না। বাক্যটি বরং اَتَعْجَبُ مِنْ اَمْرِی 'আ তা'জাবু মিন আমরি' হওয়া উচিত।' এ সেই আপত্তি যার দরুন তাৎক্ষণিকভাবে শেখের ভাগ্যে লাঞ্ছনা জুটেছে। কেননা আরবের নামকরা কবিগণ বরং জাহেলিয়াতের (প্রাগ ইসলামিক) যুগের অত্যন্ত উঁচু স্তরের খ্যাতনামা কবিদের রচিত কাব্য থেকে আমরা প্রমাণ করে দিয়েছি যে, 'আজেবা' শব্দের সংশ্লিষ্ট 'সিলাহ' (অব্যয়) 'লাম'-ও হয়ে থাকে। এখন, প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, স্বনামধন্য শেখ সাহেব এ আপত্তি উত্থাপনের দ্বারা যা তার চরম পর্যায়ের জ্ঞানাভাব ও অজ্ঞতার পরিচয় বহন করে, জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে নিজের দুর্বলতা নিজ হাতে ফাঁক করে দিয়ে নিজের চরম সম্মানহানি ঘটালেন ও শত্রু-মিত্র প্রত্যেকের কাছেই প্রমাণ করে দিলেন যে, তিনি কেবল একজন নামের মৌলবী ও উঁচু স্তরের আরবী জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। 'মৌলবী' বলে পরিচিত ব্যক্তি যদি আসল মৌলবীয়তের প্রকৃত গুণাবলী থেকে

দুর্ভাগ্যজনকভাবে বঞ্চিত হয় তাহলে তার জন্য এর চেয়ে বেশি লাঞ্ছনা আর কী হতে পারে! আফসোস এ ব্যক্তির এখনও জানা নেই যে, এ ক্রিয়াটির অর্থাৎ 'আজেবা' শব্দের 'সিলাহ' কখনও 'লাম' শব্দের দ্বারা আসে, আবার কখনও এর সিলাহ 'মিন'-ও হয়। একটি বালক, যে মাত্র هداية النحو 'হেদায়াতুন নাহু' পুস্তক পর্যন্ত পড়েছে সে-ও জানে, আরবীয় ব্যাকরণবিদরা এ শব্দের জন্য যেমন 'লামে'র সিলাহ্ প্রয়োগ করেছেন, তেমনি 'মিন' এরও। সুতরাং এ সিলাহ্র সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসাবে যে সব আরবী কবিতার পংক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে:

عجبت لمولود ليس له اب و من ذى ولد ليس له ابوان

('আজিব্তু লি-মাওলুদিন লাইসা লাহু আবুন/ওয়া মিন যি-ওলাদিন লাইসা লাহু আবাওয়ানি।')

কবি এ পংক্তিটিতে উভয় সিলাহ্র উল্লেখ করেছেন, 'লাম'-এরও এবং 'মিন'-এরও। 'দিওয়ান হিমাসাহ্' যা সরকারী কলেজগুলোতে পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত এবং এর ফাসাহাত ও বালাগাত সর্বস্বীকৃত, এ গ্রন্থের ৯, ৩৯০, ৪১১, ৪৭৫ ও ৫১১ পৃষ্ঠায় জা'ফর বিন উল্বাহ্ ও অন্যান্য কবিদের পাঁচটি পংক্তি লেখা আছে।

এগুলোতে আরবের নামজাদা কবিরা 'আজিবা' শব্দের সিলাহ 'লাম' রেখেছেন:

(1) عجبتُ لمسراها وانّى تَخلَّصَت الىَّ و باب السجنِ دونى مُغْلق

(2) عجبت لسعى الدهربينى بينها فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر

(3) عجبتُ لُبرئى منكـ ياعزّ بعد ما عمرت زمانا منكِ غير صحيح

(4) عجبت لعبد ان هجونى سفاهة ان اصطبحوا من شائهم وتقيّلوا

(5) عجبًا لا حمد و العجائب جُمّة انّى يلوم على الزمان تبذّلى

[(১) আজিব্তু লি–মাসরাহা ও আন্না তাখাল্লাসাত/ইলাইয়া ওয়া বাবুস সিজনি দুনি মুগ্লাকু। (২) আজিব্তু লি সা'য়েদ দাহরি বাইনি ওয়া বাইনাহা/ ফালাম্মান্কাযা মা বাইনানা সাকানাদ দাহ্রু। (৩) আজিব্তু লি বুরয়ী মিনকে ইয়া ইয্যু/ বা'দা মা আমিরতু যামানান মিনকে গাইরা সহীহিন (৪) আজিব্তু লি- আবদিন আন হাজাওনি সাফাহাতান/আন ইস্তাবহু মিন শায়িহিম ওয়া তাকাইয়ালু। (৫) আজাবাল্ লি-আহ্মাদা ওয়াল আজায়িবু জুম্মাতুন/আন্না ইয়ালুমু আলায্ যামানি তাবায্যালি।]

সবচেয়ে প্রথম ও প্রধান দৃষ্টান্তটি হচ্ছে মিশকাত, কিতাবুল ঈমানে ৩য় পৃষ্ঠায় ইসলামের

অর্থ সম্পর্কে নবী করীম (স.)-এর যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে- যা মুত্তাফাকুন আলায়হে- ও বটে অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিমেও এসেছে, এতে 'আজাব' শব্দের সিলাহ্ 'লামের' মাধ্যমে এসেছে। হাদীসটির শব্দগুলো হচ্ছে : عجبنا له يسئله و يُصَدِّقُهُ 'আজিব্না লাহু ইয়াস্য়ালুহু ওয়া ইউসাদ্দিকুহু' (অর্থাৎ সেই আগন্তুকের প্রতি আমরা অবাক হলাম, সে প্রশ্নও করছিল এবং সত্যায়নও করছিল -অনুবাদক)। দেখ, এ জায়গায় 'আজিবনা' এর সিলাহ 'মিন' নেই, বরং 'লাম' আছে। (সাহাবাগণ) 'আজিব্না মিনহু' বলেননি, বরং 'আজিব্না লাহু' বলেছেন। এখন বাটালবী সাহেব বলুন, বিদ্বান ও জ্ঞানীদের কাছে মৌলবী বলে পরিচিত এমন ব্যক্তির লাঞ্ছনা এটাই, না কি এর নাম অন্য কিছু? আর এ ফতওয়াও দিন, এ লাঞ্ছনাকে তাৎক্ষণিক লাঞ্ছনা বলা উচিত, না কি এর অন্য কোন নাম রাখা উচিত? বিদ্বেষপরায়ণ শেখ বাটালবী তার বিদ্বেষের আতিশয্যের দরুন নিমিষে নিজেকে এ পংক্তিটির প্রতীক বানিয়ে নিয়েছেন :

مرا خواندی و خود بدام آمدی نظر پخته ترکن که خام آمدی

'মোরা খোয়ান্দি ও খুদ বা দাম আম্দি/নাযার পুখ্তা তার কুন্ কেহ্ খাম্ আম্দি।'

লক্ষ্য করা উচিত, আমার লাঞ্ছনা আকাঙ্খা করতে গিয়ে নিজের লাঞ্ছনা নিজেই কিরূপ প্রকাশ্যে দেখিয়ে দিলেন। কোনো ন্যায়পরায়ণ মানুষ কি এমন ব্যক্তির মৌলবী (আলেম) নাম রাখতে পারে, যে মিশকাত শরীফের প্রথম হাদীসটির খবর রাখে না ও ইসলামের পরিচিতির ভিত্তিস্বরূপ হাদীসটির শব্দগুলোও জানে না এবং যে বিষয়টি স্পষ্টতঃ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত সে সম্পর্কে চুল-দাড়ি সাদা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও অবহিত নয়? অতএব যে ব্যক্তির আরবী জ্ঞানের এহেন অবস্থা এবং হাদীস সম্পর্কে যার জ্ঞানের এরূপ দৈন্যদশা যে মিশকাত শরীফের প্রথম হাদীসটির শব্দগুলো সম্পর্কেই অজ্ঞ, তার অবস্থা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত করুণ। তার লাঞ্ছনা কোনও চেষ্টার দ্বারা ঢেকে রাখার ঊর্ধ্বে। তার এ লাঞ্ছনা নিঃসন্দেহে তাৎক্ষণিক লাঞ্ছনা যা তার কামনা ও অনুরোধ অনুযায়ী প্রকাশিত হলো। সে নিজ মুখে তাৎক্ষণিক লাঞ্ছনাকেই চায়। খোদা তাআলা তা-ই দেখিয়ে দিলেন।

আমরা লিখে এসেছি, কারও মৃত্যু বা হাত পা ভেঙ্গে যাওয়ার সাথে উল্লিখিত ইলহামের কোন সম্পর্ক নেই। এটি কেবল মিথ্যাবাদীর লাঞ্ছনা প্রকাশার্থে নির্ধারিত। সুতরাং লাঞ্ছনা প্রকাশের জন্য খোদা তাআলার আরও কোনো বড় নিদর্শনের পূর্বে সাম্প্রতিক এ লাঞ্ছনাটাও মিথ্যাবাদীর জন্য খোদা তাআলার হাতের একটি চাবুকস্বরূপ। আর 'আ তা'জাবু লি-আমরি' (আমার আদেশের জন্য অবাক হচ্ছো? -অনুবাদক) ইলহামটিতে প্রকৃতপক্ষে একটি তত্ত্ব নিহিত ছিল। তা হলো, ইলহামটিতে মুহাম্মদ হুসেন বাটালবীর জন্য গোপন একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, যাতে ইঙ্গিতস্বরূপ বর্ণিত ছিল

যে, মুহাম্মদ হুসেন উল্লিখিত ইলহামের আরবী বাক্যটির ওপর আপত্তি করবে। বস্তুত এর অর্থ হচ্ছে, হে মুহাম্মদ হুসেন! তুমি কি 'লি-আমরি' শব্দের জন্য আশ্চর্য হচ্ছো এবং আমার ইলহামের এ বাক্যটিকে ভুল সাব্যস্ত কর? এর সিলাহ 'মিন' বলতে চাও? দেখ, আমি তোমার নিকট প্রমাণ করে দিব, আমি আমার খাঁটি প্রেমিকদের সাথে রয়েছি এবং তোমার লাঞ্ছনা প্রকাশ করবো।' সুতরাং ঐ লাঞ্ছনাই এখন প্রকাশিত হলো। তবে এখানেই শেষ নয়। কেননা মুহাম্মদ হুসেন বাটালবী ও তার বন্ধুরা এ লাঞ্ছনাকে হাল্ওয়ার ন্যায় হজম করে ফেলবে অথবা মায়ের দুধের মত করে গিলে ফেলবে। কাজেই, ঐ লাঞ্ছনা যা মিথ্যাবাদী ও যালিমের জন্য আসমানে প্রস্তুত করা আছে তা এর চেয়ে অনেক বড়। খোদা তাআলা আমাকে ইলহাম করেছেন: جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا '*জাযাউ সাইয়্যেয়াতিন বি-মিসলিহা*' (অপরাধের শাস্তি ঐ অপরাধের সমান সমান-অনুবাদক)। অতএব যদি আমাকে অন্যায়ভাবে লাঞ্ছনা গঞ্জনা দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে আমি খোদা তাআলার পক্ষ থেকে এমন লাঞ্ছনাকারী নিদর্শন দেখার আশা রাখি যা মিথ্যাবাদী, যালেম, মিথ্যারোপকারী ও দাজ্জালকে লাঞ্ছিত করার জন্য নির্ধারিত। যদি আমিই ওরূপ হয়ে থাকি তাহলে আমিই লাঞ্ছিত হবো। তা না হলে উভয় পক্ষের মাঝে যে প্রকৃতপক্ষে যালেম ও মিথ্যাবাদী সে ঐ লাঞ্ছনার স্বাদ ভোগ করবে। সুতরাং এহেন জ্ঞান-স্বল্পতার স্বরূপ উন্মোচন ছাড়াও মুহাম্মদ হুসেন ও তার দলকে আরও একটি তাৎক্ষণিক লাঞ্ছনাও ভোগ করতে হয়েছে। আর তা হলো, সন্দেহাতীত সত্য ঘটনাবলীর দ্বারা চূড়ান্তরূপে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, হযরত ঈসা (আ.) ক্রুশেও মারা যান নি, আকাশেও উঠে যান নি, বরং ইহুদীদের পক্ষ থেকে ক্রুশের মাধ্যমে হত্যার পরিকল্পিত চেষ্টার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ভারতবর্ষে আসেন এবং অবশেষে একশ' বিশ বছর বয়সে শ্রীনগর কাশ্মীরে ইন্তেকাল করেন। অতএব এটা মুহাম্মদ হুসেন বাটালবী ইত্যাদির জন্য ভয়ানক শোকের এবং মারাত্মক লাঞ্ছনার কারণ –গ্রন্থকার।